strikes, Vol. 2).

সহজ কথায় বিপর্যয় বা disaster-এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(a) বিপর্যয় আকস্মিক ও দ্রুত প্রভাব বিস্তারকারী।

(b) বিপর্যয়ে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদহানি ও বিপুল সংখ্যার মানুষের জীবনহানি হয়। তবে সম্পদ ও জীবনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ সহজ নয়। বিভিন্ন সময়, পরিস্থিতি ও দেশভেদে এই পরিমাপের পার্থক্য হয়। 2001 সালের World Disaster Report-এ বলা হয়— কোনো দুর্ঘটনা তখনই বিপর্যয় বলে গণ্য হবে যখন—

(1) দশ বা তার বেশি মানুষের মৃত্যু হবে।

(2) একশো বা তার বেশি মানুষ আহত হবে।

(3) পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে সাহায্যের দরকার হবে।

(4) সরকারিভাবে আপৎকালীন পরিস্থিতি ঘোষিত হবে।

আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকরা (Natural Hazard Research Group) ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে— কোনো দুর্ঘটনায় কমপক্ষে এক মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ সম্পদ হানি, অন্তত একশো মানুষের মৃত্যু এবং একশো মানুষ আহত হবে, তাকে বিপর্যয় বলা হবে (Basu, 2007)।

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), Belgium বড় বির্পযয়ের সংজ্ঞা দেন এইভাবে—

(1) অন্তত 100 মানুষের মৃত্যু হবে,

(2) দেশের জাতীয় GDP-এর এক শতাংশ বা তার বেশি পরিমাণে ক্ষতি হবে,

(3) দেশের মোট জনসংখ্যার এক শতাংশ বা তার বেশি আক্রান্ত হবে (Smith & Petley, 2007)।

দুর্যোগের সৃষ্টি

পরিবেশে দুর্যোগ সাধারণত তিনভাবে ঘটতে পারে—

(1) কেবলমাত্র প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা সংঘটিত দুর্যোগ (Natural Hazards)।

(2) প্রাকৃতিক শক্তি এবং মানুষের কার্যকলাপ উভয়েই যার জন্য দায়ী এমন দুর্যোগ (Quasi Natural Hazard)।

(3) কেবলমাত্র মানুষের অপরিণামদর্শিতার ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ (Manmade Hazards)।

ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, সুনামি প্রভৃতি দুর্যোগ কেবলমাত্র প্রাকৃতিক

কারণেই সৃষ্টি হয়। এগুলির উপর মানুষের কোনো হাত নেই। মানুষ এদের কাছে অসহায়।

বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ, দাবানল, ভূমিধস ইত্যাদি দুর্যোগ প্রাকৃতিক কারণেই হয়। কিন্তু মানুষের কার্যকলাপের ফলে নদীর খাত মজে যেতে পারে, বাঁধের জল ছাড়ায় গাফিলতি হতে পারে। এসব কারণে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। শুষ্ক, আধা শুষ্ক অঞ্চলে এমনকি আর্দ্র অঞ্চলেও অবৈজ্ঞানিকভাবে জলসম্পদ ও ভূমির ব্যবহার খরা ডেকে আনতে পারে। দুর্ভিক্ষ, দাবানলের প্রসঙ্গে একই কথা বলা যায়। পার্বত্যঢালে অবৈজ্ঞানিকভাবে কৃষিকার্য বা নগরায়ণের ফলে ভূমির ধস প্রবণতা বেড়ে যেতে পারে। কাজেই এগুলি আধাপ্রাকৃতিক দুর্যোগ (Quasi Natural Hazard)।

যদি কোনো অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রচুর সম্পদ ও জীবনহানি হয়, জঙ্গিগোষ্ঠী বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কোনো এলাকাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে, অথবা যুদ্ধের সময় বিরোধী এলাকায় বোমা,রকেট ইত্যাদির সাহায্যে এলাকাটিকে শ্মশান করে দেওয়া হয়, যদি বিষাক্ত রাসায়নিক বা মারণরোগের জীবাণু ছড়িয়ে দেওয়া হয়, প্রাকৃতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিবেশকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, তবে সেখানে প্রকৃতির কোনো হাত থাকে না। এগুলিই হল মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ।

মানবসভ্যতার উন্নয়নের সঙ্গে দুর্যোগ সৃষ্টির সম্পর্ক ঃ

গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, মানবসভ্যতার জয়যাত্রা, মানুষের আর্থিক উন্নতি, এসবই পৃথিবীতে দুর্যোগের ঘনঘটা বাড়িয়ে চলেছে। কারণ ভূমিকম্প বা বন্যা যদি জনহীন প্রান্তরে ঘটতো, তবে সেগুলি প্রাকৃতিক ঘটনা বলে স্বীকৃত হতো। এই ধরনের ঘটনায় মানুষ বা তার সম্পদের ক্ষতি হলে, তবেই এগুলি দুর্যোগ। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, আরও বেশি বেশি মানুষ ক্ষতির ঝুঁকির কবলে পড়ছে আর Vulnerable বা বিপন্ন মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে। সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির মাত্রাও বাড়ছে। কারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়লে জনপ্রতি সম্পদ ব্যবহার ও খরচের মাত্রাও বাড়ছে। ফলে পরিবেশের মান সর্বত্র ধরে রাখা যাচ্ছে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়। মানুষের সংখ্যা ও তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ার ফলে জনপ্রতি ও মোট খাদ্যের চাহিদা বাড়ছে। কিন্তু বিশ্বউষ্ণায়ন, নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রসারের ফলে কৃষিক্ষেত্র ও কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ বিশ্বজুড়ে কমে যাচ্ছে। কাজেই অচিরেই এক দেশে খাদ্যের অকুলান হলে, আন্তর্জাতিক বাজার থেকে আমদানি করা যাবে না, কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করার মতো পর্যাপ্ত খাদ্য থাকবে না। বিজ্ঞানীরা বলছেন, একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সমগ্রবিশ্ব খাদ্যসংকট বা Food insecurity তে ভুগবে। কাজেই সভ্যতার উন্নয়ন এবং দুর্যোগ হাত ধরাধরি করে চলেছে। পরবর্তী চিত্রটিতে এই সম্পর্কটিকেই সহজভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

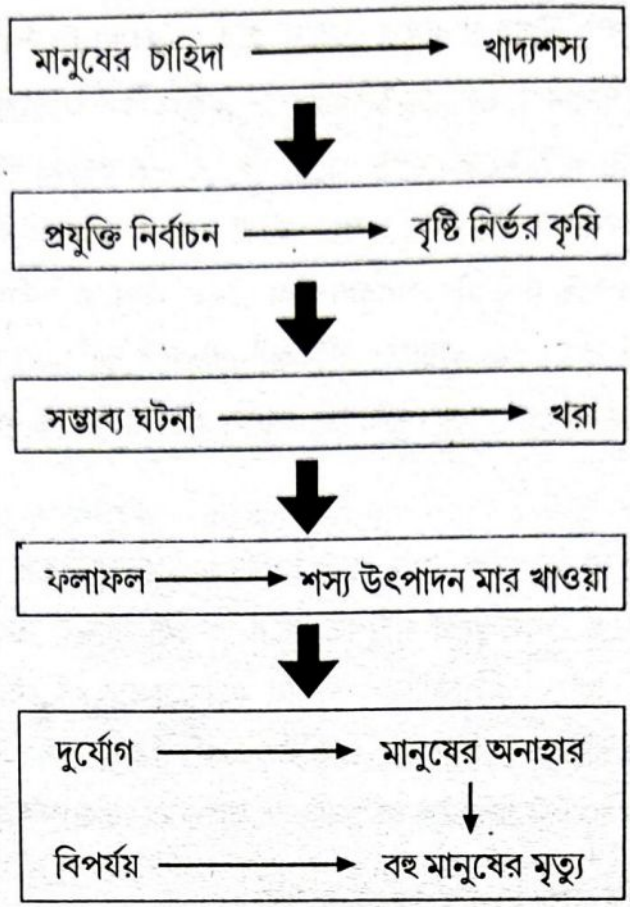

দুর্যোগের শ্রেণীবিভাগ ঃ

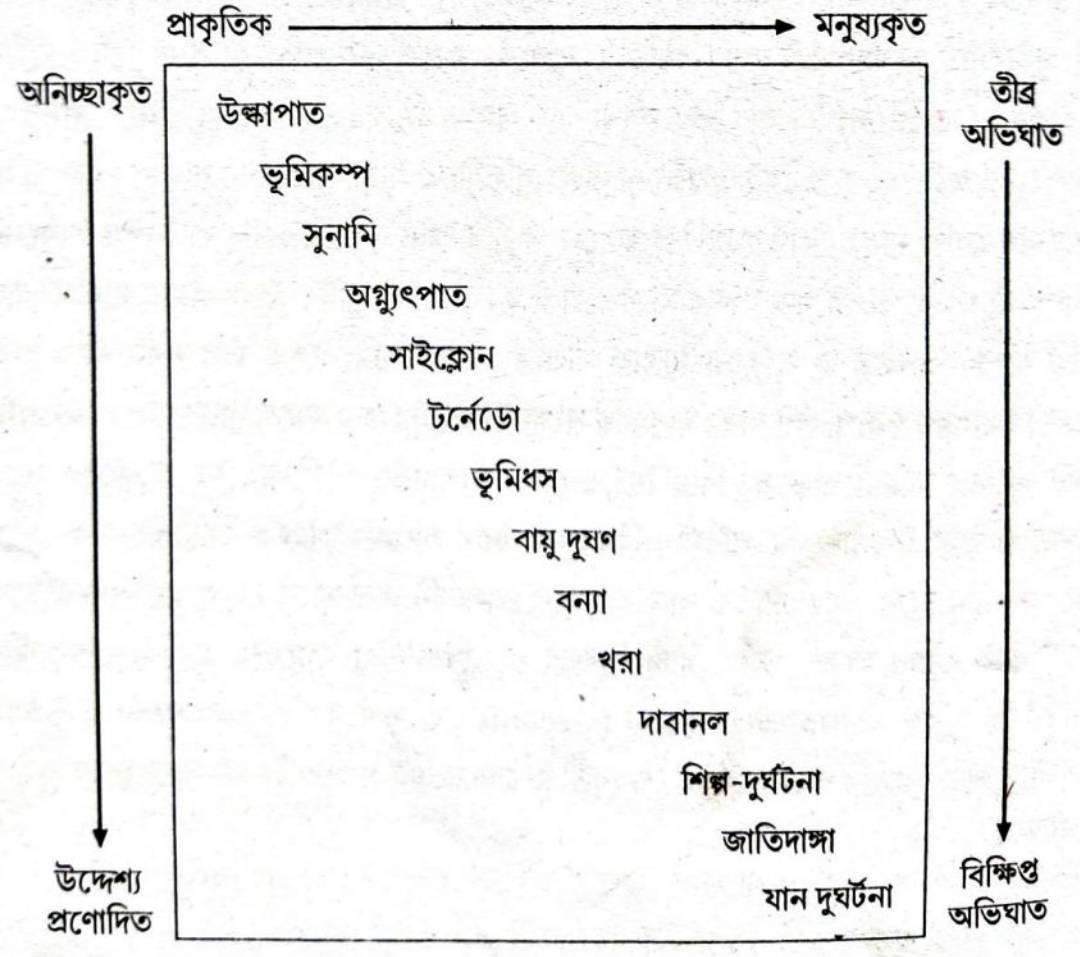

সূত্র ঃ Smith and Petley, 2009.

আগের পাতার চিত্রটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, উল্কাপাত বা ভূমিকম্পজনিত দুর্যোগ সম্পূর্ণই প্রাকৃতিক, সেটা মানুষের অনিচ্ছাকৃত ও অভিঘাতও তীব্র। আবার ভূমিধস, বন্যা, খরা প্রভৃতি দুর্যোগে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যকৃত কারণ দুই-ই দায়ী। আবা ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার মতো শিল্প দুর্ঘটনা, জাতিদাঙ্গা বা যান দুর্ঘটনা ইত্যাদি দুর্যোগ একেবারেই মনুষ্যকৃত এবং কখনও কখনও দুষ্ট মানুষের কু-উদ্দেশ্যও এতে মিশে থাকে। এছাড়াও দুর্যোগের প্রভাব কার বা কিসের উপর পড়ছে তা বিচার করেও দুর্যোগের শ্রেণীবিভাগ করা যায়। যেমন—

দুর্যোগের শ্রেণী	ফলাফল
1) মানুষের উপর আঘাতকারী	মৃত্যু, দৈহিক আঘাত, রোগের প্রাদুর্ভাব, মানসিক অশান্তি
2) জিনিসপত্রের উপর আঘাতকারী	সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি, আর্থিক ক্ষতি
3) পরিবেশের উপর আঘাতকারী	জীববৈচিত্র্যের ধ্বংস, দূষণ, সুযোগ সুবিধা ও পরিষেবার ক্ষতি

কোনো দুর্যোগ যখন ব্যাপকহারে প্রাণহানি ও সম্পদহানি ঘটায়, তখন সেটা বিপর্যয়ে পরিণত হয়। কোনো দুর্যোগ বিপর্যয়ে পরিণত হবে কিনা, সেটা দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায় মানুষের বিপন্নতার মাত্রার উপর নির্ভর করে। বিপন্নতার মাত্রা আবার কয়েকটি উপাদানের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে।

বিপন্নতার মাত্রা নির্ধারক কারণ সমূহ ঃ

দুর্যোগের ফলে মানুষের বিপন্নতা কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন—

(1) **দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতা (Resilience) ঃ** এই ক্ষমতা যার যত বেশি থাকবে, তার বিপন্নতাও তত কমবে। অনুন্নত দেশগুলিতে প্রতিবছরই, বন্যা, খরা, মহামারী প্রভৃতির সঙ্গে থাকতে থাকতে, মানুষের একটা সহ্যশক্তি তৈরি হয়ে যায়। আবার উন্নত বিশ্বের দেশগুলি খুব দ্রুত ভেঙে পড়া পরিষেবা ব্যবস্থা চালু করে, উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে প্রচুর অর্থ খরচ করে দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে।

(2) **পরিকাঠামোয় নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) ঃ** উন্নত বিশ্বের বাড়িঘর মজবুত। দুর্যোগের আগাম আভাস দেওয়ার পরিকাঠামোও অনেকাংশে নিখুঁত। যেমন— জাপানে প্রচুর ভূমিকম্প হলেও সেদেশে ঘরবাড়ি ও অন্যান্য পরিকাঠামো এমনভাবে তৈরি যে, খুব একটা প্রভাব পড়ে না। কিন্তু অনুন্নত বিশ্বে এই সুবিধা পাওয়া যায় না, তাই বিপন্নতাও বেশি হয়।

(3) **অর্থনৈতিক কারণ (Economic factors) ঃ** অনুন্নত বিশ্বের দরিদ্র মানুষের হাতে

দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠার মতো পুঁজি, জমি, অন্যান্য সম্পদ, যন্ত্রপাতি কিছুই থাকে না। সাধারণ জীবনেই তারা খাদ্য বা চিকিৎসা সংকটে ভোগে। কাজেই বলা যায় পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক ক্ষমতার অভাব অনুন্নত বিশ্বের মানুষের বিপন্নতা, উন্নত বিশ্বের মানুষের তুলনায় অনেক বাড়িয়ে দেয়।

(4) **সামাজিক কারণ (Social factors) ঃ** বয়স ও লিঙ্গভেদে মানুষের বিপন্নতা বদলে যায়। সচরাচর শিশু বা নাবালক এবং বৃদ্ধদের বিপন্নতা সমর্থ মানুষের চেয়ে বেশি। আবার পুরুষদের তুলনায় নারীদের বিপন্নতা বেশি। কারণ শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদের দৈহিক ক্ষমতা কম, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন কম। ফলে যেকোনো দুর্যোগে সমর্থ পুরুষদের তুলনায় এদের প্রাণহানি বা আঘাতের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

(5) **রাজনৈতিক কারণ (Political factors) ঃ** অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি, দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের ব্যর্থতা বাড়িয়ে দেয়। দেশের অভ্যন্তরে জাতিদাঙ্গা, সীমান্তে বহিঃশত্রুর আক্রমণ অথবা প্রতিবেশী দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, শরণার্থী মানুষের বিপন্নতা বাড়িয়ে তোলে।

(6) **সামগ্রিক পরিবেশের মানের অবনমন (Environmental degradation) ঃ** বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ, অরণ্য ছেদন, অতিরিক্ত কৃষি, বিশ্বউষ্ণায়ন, ওজোনস্তর ক্ষয়, আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘনঘন খরা ও বন্যা ডেকে আনে। অস্বাভাবিক বর্ষা ভূমিধস, পাড় ভাঙন প্রভৃতি দুর্যোগকে বাড়িয়ে তোলে। এর ফলেও মানুষের বিপন্নতা বাড়ে।

আগের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায়, যে উন্নত বিশ্বের মানুষের থেকে অনুন্নত বিশ্বের মানুষের বিপন্নতা অনেক বেশি। এইসব দেশে জনসংখ্যাও বেশি, যেকেনো দুর্যোগে প্রচুর প্রাণহানি ও সম্পদহানির সম্ভাবনাও অনেক বেশি। তাই অনুন্নত বিশ্বে দুর্যোগগুলি প্রায়শই বিপর্যয়ে পরিণত হয়।

দুর্যোগ মোকাবিলার উপায় বিষয়ে ধারণার ক্রমবিবর্তন ঃ

প্রাচীনকালে মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগকে ঈশ্বরের অভিশাপ বলে মনে করতো এবং অসহায়ভাবে প্রকৃতির রোষের কাছে আত্মসমর্পণ করতো। পুজো আচ্চা করে প্রকৃতিকে শান্ত করার চেষ্টা করতে হত। ধীরে ধীরে সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে দুর্যোগ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা বদলাতে থাকে।

প্রযুক্তির সাহায্যে সমাধানের খোঁজ (Search for engineering solution) : প্রায় 4000 বছর আগে মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ প্রথম নদীতে বাঁধ দেওয়া শুরু করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি একের পর এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষকে দুর্যোগ মোকাবিলার পথে অনেকখানি

এগিয়ে দেয়। আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার প্রযুক্তি আসার ফলে কোনো এলাকায় খরা ও বন্যা ঘটার আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হয়। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রযুক্তিগত সমাধানকেই প্রাধান্য দেওয়া হত।

আচরণ পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাধানের খোঁজ (Search for behavioural solution) : বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মানুষের বিভিন্ন উচ্চাকাঙ্ক্ষী কার্যকলাপও যে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উস্কে দেয়, সে বিষয়ে সচেতনতা তৈরি হয়। অনেকক্ষেত্রেই মানুষের আচরণ বদল করে, সম্পদ ব্যবহারের পদ্ধতি ও প্রকরণ বদল করে দুর্যোগ মোকাবিলার চেষ্টা শুরু হয়।

টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে সমাধানের খোঁজ (Search for solution in sustainable development) : 1970-এর দশক থেকে বৈজ্ঞানিকরা ভাবতে শুরু করেন যে, উন্নয়নের বৈষম্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। কারণ অনুন্নত দেশগুলিতে পুঁজি ও পরিকাঠামোর অভাব সহজেই দুর্যোগকে বিপর্যয়ে পরিণত করছে। কাজেই কোনো দেশে টেকসই উন্নয়ন দুর্যোগের সংঘটন ও ভয়াবহতাকে কমিয়ে দিতে পারে।

সার্বিক সমাধানের খোঁজ (Search for a complex integrated solution) : একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করেছেন যে, কোনো অনুন্নত এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা করতে গেলে প্রযুক্তিগত সমাধানও যেমন প্রয়োজন, তেমন প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার বিষয়ে মানুষের আচরণেরও বদল দরকার। আবার সার্বিকভাবে প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে sustainable development বা টেকসই উন্নয়নও দরকার। তাই কোনো একভাবে সমাধানের চেষ্টা না করে সামগ্রিকভাবে সমাধান করাই শ্রেয়।

দুর্যোগের সঙ্গে মোকাবিলা করার উপায় ঃ

দুর্যোগ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক স্তরে রাষ্ট্রসংঘের প্রচেষ্টা ঃ

(1) কোনো দেশে দুর্যোগ মোকাবিলায় দ্রুত, কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনে সাহায্য করা— এইসব কাজের জন্য রাষ্ট্রসংঘ Disaster management team গঠন করে।

(2) 1971 সালে বিপর্যস্ত অঞ্চলে দ্রুত ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার জন্য তৈরি হয় United Nation's Disaster Relief Co-ordinator। এদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার আবেদন করে 50 হাজার ডলার পর্যন্ত সাহায্য পেতে পারে।

(3) বিধ্বস্ত অঞ্চলে উন্নয়ন ও বিপর্যয়ের প্রভাব নিবারণের জন্য অর্থ সাহায্য করে United Nations Development Programme.

(4) কৃষি, পশু, পাখি ও মাছ উৎপাদকের পুনর্বাসনে পরামর্শ ও অর্থসাহায্য দেয় Food and Agriculture Organization (FAO)।

(5) ত্রাণ, পুনর্গঠন, পুনর্বাসনে বার্ষিক প্রায় সাড়ে চার কোটি ডলার পর্যন্ত সাহায্য করতে পারে World Food Programme (WFP)।

(6) বিধ্বস্ত অঞ্চল থেকে দুর্গত মানুষ যখন অন্য অঞ্চলে, অন্য দেশে আশ্রয় নেন, তখন সেই শরণার্থীদের সুরক্ষার জন্য সাহায্য করে United Nations High Commission for Refugees (UNHCR)।

(7) বিপর্যয়ের প্রাকৃতিক উৎস, ঝুঁকির অনুমান ইত্যাদি গবেষণার কাজে যুক্ত হয় United Nations Educational, Scientific and Culture Organization (UNESCO)।

(8) বিপর্যস্ত বা দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে উপযুক্ত বাসস্থান তৈরির বিষয়ে পরিকল্পনা, পরামর্শ ও আর্থিক অনুদান দিয়ে সাহায্য করে United Nations Centre for Human Settlement (UNCHS) Habitat।

(9) দুর্যোগ প্রবণ ও বিপর্যস্ত দেশে শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে নজর রাখে, বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থব্যয় করে— United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF).

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অন্যান্য সংস্থা

(1) জাপানের কোবে শহরে আছে Asian Disaster Reduction Centre। এই সংস্থাটি এশিয়ার দুর্যোগগ্রস্ত দেশগুলিকে বিভিন্ন প্রকার সাহায্য করে।

(2) এ ছাড়াও এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দুর্যোগ মোকাবিলায় আরও দুটি উল্লেখযোগ্য সংস্থা হল— Asian Disaster Preparedness Centre (রাষ্ট্রসংঘের ভারপ্রাপ্ত সংগঠন) এবং Asia-Pacific Disaster Management Centre (ফিলিপিনসের ম্যানিলায়-এর সদর দপ্তর)।

আন্তর্জাতিক সম্মেলন

1992 সালে ব্রাজিলের রিও-ডি জেনিরোতে যে বসুন্ধরা সম্মেলন বসে সেখানে একুশ শতকের উপযোগী একটি অঙ্গীকার তালিকা গ্রহণ করা হয়। সেখানে একটি ধারায় বলা হয়েছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগগ্রস্ত দেশগুলিকে আন্তর্জাতিক সাহায্য দান অবশ্য কর্তব্য হবে।

এ ছাড়াও রাষ্ট্রসংঘের এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে 1994 সালের 23 মে থেকে 27 মে জাপানের ইয়াকোহামা শহরে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবমুক্ত অধিকতর নিরাপদ বিশ্ব তৈরির জন্য অঙ্গীকার করা হয়। এবং

সেই সঙ্গে দুর্যোগগ্রস্ত অঞ্চলে দুর্গত মানুষের উন্নয়নে গাফিলতি ও বিশৃঙ্খলার কড়া সমালোচনা করা হয়।

বিপর্যয় মোকাবিলায় ভারত সরকারের ভূমিকা

ভারত এমনই একটি দেশ যেখানে, দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও মৃত্যু সাধারণ মানুষের জীবনে স্বাভাবিক ব্যাপার। মহামারি থেকে খরা, বন্যা থেকে ঘূর্ণিঝড়, কিংবা ভূমিকম্প, ভূমিধস, এমনকি সুনামি কোনো দুর্যোগের হাত থেকেই এদেশের মুক্তি নেই। প্রতি বছর এইসব দুর্যোগের ফলে মৃত, আহত, রুগ্‌ণ, পঙ্গু মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জাতিদাঙ্গা, জঙ্গি নাশকতা এবং মারণ রোগের প্রাদুর্ভাব।

নথিপত্র থেকে জানা যায়, 1988 থেকে 1997 এই দশ বছরে 24 মিলিয়ন লোক বিপর্যয়ের কবলে পড়েছেন এবং প্রতি বছর গড়ে 5,116 জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। 1998 সালে বিভিন্ন দুর্যোগে বিপর্যস্ত মানুষের সংখ্যা দাঁড়ায় 3,41,12,566 এবং মৃত্যু হয় 9846 জন মানুষের। 1985 থেকে 1995 এই সময়ে বছরে গড়ে এই কারণে আর্থিক ক্ষতি হয় 1,883.93 মিলিয়ন US ডলার।

2002 সালের জুন মাসের পর থেকে বিপর্যয় মোকাবিলার কাজ ভারত সরকার স্বরাষ্ট্র বিভাগের উপর ন্যস্ত করেছে। তবে খরা মোকাবিলার ভার আছে কৃষিদপ্তরের উপর। 2004 সালে ভারত সরকার বিধ্বংসী সুনামি ঘটার পরে ভূমিকম্প ও সুনামির আগাম পূর্বাভাস ও নির্দেশ প্রচারের জন্য যন্ত্রপাতি বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোনো বিপদ ঘটে গেলে কেন্দ্র সরকারের কৃষি, সমাজকল্যাণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, কর্মসংস্থান, পরিবেশ ও বন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্প, বিমান, রেল, পরমাণু গবেষণা, স্বরাষ্ট্র, মানবসম্পদ বিকাশ, জলসম্পদ, প্রতিরক্ষা, অর্থ, যোগাযোগ দপ্তর এবং পরিকল্পনা কমিশনের মধ্যে জরুরি সমন্বয়সাধন করা হয়। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে থাকে তহবিল যেখান থেকে দ্রুত ত্রাণের জন্য খাদ্য, ওষুধপত্র এবং অন্যান্য সরঞ্জামের অর্থ যোগান দেওয়া হয়। উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি মনে রেখেও বলা যায়, ভারতে দুর্যোগ মোকাবিলার ব্যবস্থা দুর্ঘটনা ঘটার পরে উদ্যোগী হয় (Reactive), কিন্তু ঘটার আগে প্রতিবিধানে গাফিলতি দেখায় (Not proactive)।

আন্তর্জাতিক স্তরে কিন্তু এখন দুর্ঘটনা ঘটার পরে মোকাবিলার থেকেও ঘটনা ঘটার আগে আগাম পূর্বাভাস ও প্রস্তুতির উপর অনেক বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক প্রবণতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বর্তমানে ভারতেও এই ধরনের **দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতির** উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। **বিভিন্ন কর্মসূচি** নেওয়া হয়েছে, যেমন—

(1) মানুষ ও সম্পদের উন্নয়ন।

(2) বিপর্যস্ত ও বিপর্যয়প্রবণ অঞ্চলের সঠিক তথ্যসংগ্রহ ও মজুত রাখা এবং এই কাজে মহাকাশ দপ্তর, দূর অনুধাবন (Remote sensing) ব্যবস্থা এবং Geographic Information System-এর সাহায্য নেওয়া।

(3) জাতীয় স্তরে National Committee for Disaster Management নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।

(4) জনশিক্ষা বৃদ্ধি এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিপর্যয় মোকাবিলায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

(5) এই সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্প অনুমোদন করা।

(6) পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে দুর্যোগ এলে গ্রামস্তরে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতির আয়োজন সম্পূর্ণ করা।

(7) পেশাদারি প্রতিষ্ঠান যেমন সেনাবাহিনী, আবহাওয়া দপ্তর, পুলিশবাহিনী, পূর্তদপ্তর, দমকল বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, অসামরিক প্রতিরক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর। এগুলির মধ্যে তথ্যের আদানপ্রদান ও জরুরি সমন্বয়ের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকা এবং প্রত্যেকের কাজ, দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া।

(8) সঠিক তথ্য, সঠিক সময়ে, সঠিক জায়গায় মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার পরিকাঠামো তৈরি। এটাতে ব্যর্থ হলে, আংশিক সত্য ও গুজবের চাপে দুর্যোগগ্রস্ত মানুষের দুর্গতি বহুগুণ বেড়ে যায়। যেসব দুর্যোগের আগাম পূর্বাভাস পাওয়া যায়, সেইসব ক্ষেত্রে আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা তৈরি রাখা।

(9) সরকারি স্তরে নির্দিষ্ট সময় অন্তর দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে মহড়ার ব্যবস্থা করা।

(10) খরা, বন্যা বা ঘূর্ণিঝড় প্রবণ অঞ্চলে ফসলের বিমার ব্যবস্থা করা।

(11) ভূপালের মতো রাসায়নিক বিপর্যয় যাতে না হয় সেজন্য শিল্প কারখানাগুলির দিকে কড়া নজর রাখা।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে গেলে কী করা উচিত

(1) অন্যের প্রতি সহমর্মিতা, কর্তব্য, দায়িত্ব সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষকে সচেতন থাকতে হবে।

(2) গোষ্ঠীবদ্ধভাবে একসঙ্গে দুর্যোগ মোকাবিলার চেষ্টা করতে হবে।

(3) বিপর্যয়ের ফলে মৃত্যু, অঙ্গহানি, পঙ্গুত্বের জন্য কর্মক্ষম মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে। ফলে অতি দ্রুত পরিবারে বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্তরে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

(4) অসুস্থ মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

(5) শরণার্থী শিবিরে শিশু ও নারীরা পাচার ও শ্লীলতাহানির কবলে পড়ে, তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

(6) বিপর্যয়গ্রস্ত মানুষের শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যও বিপর্যস্ত হয়। চারিপাশে ধ্বংস ও শোকের আবহে মানসিক শূন্যতা ও অবসাদ সৃষ্টি হয়। এদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে সমাজকে সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হবে।

প্রশ্নাবলী

1। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কাকে বলে? এর শ্রেণিবিভাগ করো।

2। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা কীভাবে করা যায়, বিশদে ব্যাখ্যা করো।

3। দুর্যোগ কাকে বলে? ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা এবং সৃষ্টির কারণ অনুযায়ী এর শ্রেণিবিভাগ করো। উপযুক্ত উদাহরণ দাও।

4। বিঘ্ন ও বিপর্যয়ের তুলনা করো। উন্নয়নশীল বিশ্বে বিপর্যয় বেশি ঘটার কারণ কী?

5। দুর্যোগের মোকাবিলা কীভাবে করা যায় তা বিশদে ব্যাখ্যা করো।

তথ্য আকর ঃ

1. প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা—*তারক ব্যানার্জী। ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেল্‌থ্‌ অ্যাসোসিয়েশন।*
2. India disasters report towards a policy initiative—*edited by Parasuraman S. and Unnikrishnan P.V., Oxford, 2001.*
3. *Some Aspects of Natural Disaster Management, Prof. Dilip Kumar Sinha, Institute for Rural Development, Natural Disaster and Environmental Management (IRUDEN DEM), 2002.*
4. *Hazard Perception and Disaster Management, edited by Dr. Mridula Niyogi, Dr. Sriparna Bose, Dr. Bansari Guha, Ms. Bhaswati Ray, Sivanath Sastri College, Department of Geography, 2007.*
5. *Society Development and Environment, Prof. Sunil Kumar Munsi, Felicitation Volume, edited by Ranjan Basu, Sukla Bhaduri, Progressive Publishers, 2006.*
6. *Coping with Natural Hazards : Indian context, edited by K. S. Valdiya, Orient Longman, 2004.*
7. *Smith, Keith and Petley, David N. (2009) : Environmental Hazards, Assessing risk and reducing disaster, Fifth ediion, Routledge, London and New York.*

(d) ভূকম্পীয় তরঙ্গের প্রাবল্যতা (Magnitude of earthquake wave)

(e) ভূকম্পীয় তরঙ্গের গড় ত্বরণ (Average acceleration of earthquake wave) প্রভৃতি।

➢ ***মানচিত্র নির্মাণ (Map Construction) :*** ভূমিকম্পের মানচিত্র নির্মাণে আন্তর্জাতিক স্তরে একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে, যা "Global Seismic Hazard Assessment Program (GSHAP)" নামে পরিচিত। McGuire-এর "Peak Ground Accelerations (PGA)" পরিমাপক পদ্ধতিতে 'FRISK88M Software'-কে আদর্শভাবে ব্যবহার করে আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে প্রতিটি ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলগুলির মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

1996 সালের পর থেকে হায়দ্রাবাদে অবস্থিত "National Geo Physical Research Institute (NGRI)" ভারতের ভূমিকম্পের বিভিন্ন উৎসস্থল এবং ভূমিকম্পের বিভিন্ন তীব্রতা অঞ্চলের মানচিত্রগুলিকে দায়িত্বসহকারে প্রকাশ করে থাকে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট 'NOAA Catalogue'-এ ভারতের 0°-40° N এবং 65°-100° E পরিসরে ভূমিকম্পের মানচিত্রগুলি নির্মাণ করা হয়। এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকম্পের মানচিত্র নির্মাণের কৌশল উপস্থাপন করা হল।

1. Seismicity and Source Zonation Map : ভূকম্পীয় উৎস সংক্রান্ত আঞ্চলিক মানচিত্রটি মূলত কোনো অঞ্চলের ভূকম্পীয় তরঙ্গের প্রকৃত গতিবিধি অনুধাবন করেই নির্মাণ করা হয়।

▪ **কৌশল (Techniques) :** এই ধরনের মানচিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে যে কৌশলগুলি অবলম্বন করতে হয়, তা হল—

(i) **অনুশীলনক্ষেত্র (Study Area)** : মানচিত্র নির্মাণের জন্য প্রথমেই অতীতে একাধিকবার ভূমিকম্প ঘটেছে এরকম একটি স্থানকে অনুশীলনক্ষেত্র রূপে নির্বাচন করা হয়।

(ii) **পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (Observation Centre)** : এরপর, ভূমিকম্পের বেশ কয়েকটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থির করা হয়। এখানে ভূমিকম্পের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রগুলিকে চ্যুতি অঞ্চল বা বিভিন্ন পাতসীমানা (Plate boundery)-কে অবলম্বন করে স্থির করা হয়।

(iii) **তথ্য সংগ্রহ (Data Collection)** : এই পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বিভিন্ন মাত্রার ভূমিকম্প এবং তার উৎসস্থলের গভীরতা সংক্রান্ত তথ্যগুলিকে দীর্ঘকাল ধরে নিবন্ধিকরণ করা হয়। এখানে যে সমস্ত তথ্যগুলি বিশেষ প্রাধান্য পায়, সেগুলি হল—

- ভূমিকম্পের উৎসস্থলের অবস্থান তথা ভূমিকম্পের কেন্দ্র।
- ভূমিকম্পের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া তরঙ্গের পরিধি।
- ভূমিকম্পে প্রভাবিত সামগ্রিক অঞ্চল।
- সক্রিয় চ্যুতি অঞ্চল।
- ভূগাঠনিক পাতের গতিবিধি।
- সমভূকম্পন অঞ্চল প্রভৃতি।

(iv) **সংকলন (Compilation)** : ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত সমস্ত ধরনের তথ্য বিশ্লেষণ করে এরপর মানচিত্র সংকলন করা হয়। প্রসঙ্গত, ভারতের ভূতাত্ত্বিক গঠনকে প্রাধান্য দিয়ে 1984 খ্রিস্টাব্দে Khattri যে 'Seismicity and Source Zonation Map' নির্মাণ করেছিলেন, তার ভিত্তিতে এখানে ভূমিকম্প সংক্রান্ত মানচিত্র নির্মাণ কৌশলটি তুলে ধরা হল।

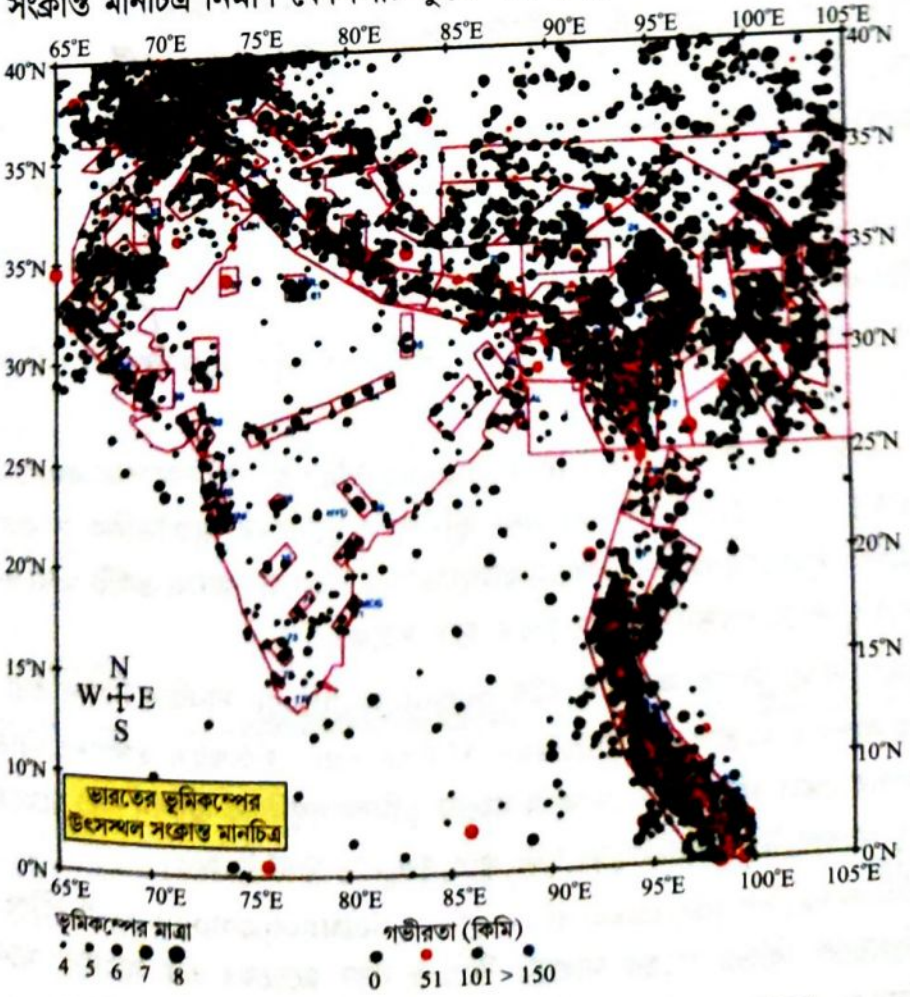

চিত্র 5.2 : ভূমিকম্পের উৎসস্থল সংক্রান্ত মানচিত্র (Khattri প্রদত্ত)

(a) ভূমিকম্পের উৎসস্থল সংক্রান্ত মানচিত্র নির্মাণের জন্য ভারতের যে অঞ্চলটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে, তার বিস্তার হল 0° থেকে 40° উত্তর অক্ষরেখা এবং 65° পূর্ব থেকে 105° পূর্ব দ্রাঘিমারেখা।

(b) এরপর নির্ধারিত একটি বিশেষ ক্যাটালগে ভারতের চ্যুতিরেখা অঞ্চলগুলিকে অধ্যারোপ (Superimposed) করা হয়েছে।

(c) সংশ্লিষ্ট চ্যুতিরেখা অঞ্চল বরাবর অতীতে বিভিন্ন সময়ে ঘটা ভূমিকম্পের উৎসস্থলগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ভূমিকম্পের উৎসস্থল অনুসারে এখানে 1-86 টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

(d) এরপর ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রীয় স্থলগুলিকে ভূকম্পের মাত্রা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের কালো রঙের ছোটো, মাঝারি কিংবা বড়ো অসংখ্য বিন্দু আকারে সংশ্লিষ্ট ক্যাটলগে প্রতিস্থাপিত করা হয়।

(e) সমগ্র মানচিত্রটিতে বিভিন্ন রঙের বিন্দু দ্বারা ভূমিকম্পের গভীরতা কতটা তা উপস্থাপন করা হয়েছে।

(f) এছাড়াও, ভূমিকম্পের উৎস সংক্রান্ত মানচিত্রটিতে ভারতের বিভিন্ন ভূমিকম্পপ্রবণ শহরগুলিকে উপস্থাপন করার জন্য ইংরাজির বর্ণমালার একাধিক অক্ষরকে প্রয়োগ করা হয়েছে।

উপাদান	বিভিন্ন প্রকৃতি	নির্দেশক
ভূমিকম্পের মাত্রা	অতি মৃদু	•
	মৃদু	•
	শক্তিশালী	•
	অতি শক্তিশালী	•
	অত্যন্ত শক্তিশালী	•
ভূমিকম্পের গভীরতা	অতি স্বল্প গভীর	কালো বর্ণ
	স্বল্প গভীর	লাল বর্ণ
	মধ্যম গভীর	সবুজ বর্ণ
	অতি গভীর	নীল বর্ণ
ভূমিকম্পপ্রবণ শহরের নাম	BUJ	ভূজ
	CAL	কোলকাতা
	HYD	হায়দ্রাবাদ
	JBL	জব্বলপুর
	SRI	শ্রীনগর
	NDL	নতুন দিল্লি
	LAH	লাটুর
	MDS	মাদ্রাজ
	PBL	পোর্টব্লেয়ার

প্রসঙ্গত, ভূমিকম্পের উৎসস্থল সংক্রান্ত মানচিত্র নির্মাণে ব্যবহৃত নির্দেশকগুলি উলিখিত ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল।

2. Seismotechtonic Map : Seismotechtonic Map হল ভূমিকম্পের এমনই এক বিশেষ ধরনের মানচিত্র, যেখানে ভূতত্ত্ব, ভূ-প্রাকৃতিক সংস্থান এবং ভূমিকম্প দুর্যোগের মাত্রাভিত্তিক সংকলনগুলি বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। তা ছাড়া এই মানচিত্রে আধুনিক পাতসঞ্চালন তত্ত্বের সাহায্যে কোনও একটি অঞ্চলের গাঠনিক পরিসরে ভূমিকম্পের উৎসস্থলগুলি বিশেষভাবে উপস্থাপিত হয়ে থাকে।

প্রসঙ্গত, যে সমস্ত বিষয়গুলিকে অধ্যায়ন করে Seismotechtonic মানচিত্র নির্মাণ করা হয়, তা হল—

(a) **ভূমিকম্পের মাত্রা (Earthquake Magnitude) :** এখানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘটিত রিখটার স্কেল অনুযায়ী 5 থেকে 8 মাত্রার ভূমিকম্পগুলিকে প্রদর্শন করা হয়েছে। মানচিত্রে প্রতিটি ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্ত (○) দ্বারা চিহ্নিত।

(b) **গাঠনিক পরিসর (Structural range) :** Seismotechtonic মানচিত্রটিতে ভূগাঠনিক প্রতিটি পরিসরকে বিভিন্ন রঙের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর সাহায্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলের গাঠনিক ঝুঁকিগুলিকে স্পষ্ট অনুধাবন করা যায়।

(c) **ভূতাত্ত্বিক গঠন (Geological Structure) :** সংশ্লিষ্ট মানচিত্রে যে সমস্ত ভূতাত্ত্বিক গঠনগুলিকে প্রদর্শন করা হয়েছে, সেগুলি হল—(a) চ্যুতি (Fault), (b) উপপৃষ্ঠীয় চ্যুতি (Sub Surface Fault), (c) স্বাভাবিক চ্যুতি (Normal Fault), (d) নব্যভূগাঠনিক চ্যুতি (Neotectonic Fault), (e) বিখণ্ডিত অঞ্চল (Shear Zone), (f) থ্রাস্ট ও সন্ধি অঞ্চল (Thrust and Suture Zone), (g) সক্রিয় অন্তঃপাত সীমান্ত (Active subduction boundery) প্রভৃতি।

এছাড়াও, সংশ্লিষ্ট মানচিত্রটিতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যভিত্তিক শহর এবং রাজ্যভিত্তিক সীমানা বিশেষভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

কৌশল (Techniques) : Seismotechtonic Map নির্মাণ কৌশলটি অনেকটা BMTPC প্রদত্ত Earthquake Hazard Map নির্মাণের কৌশলের মতো।

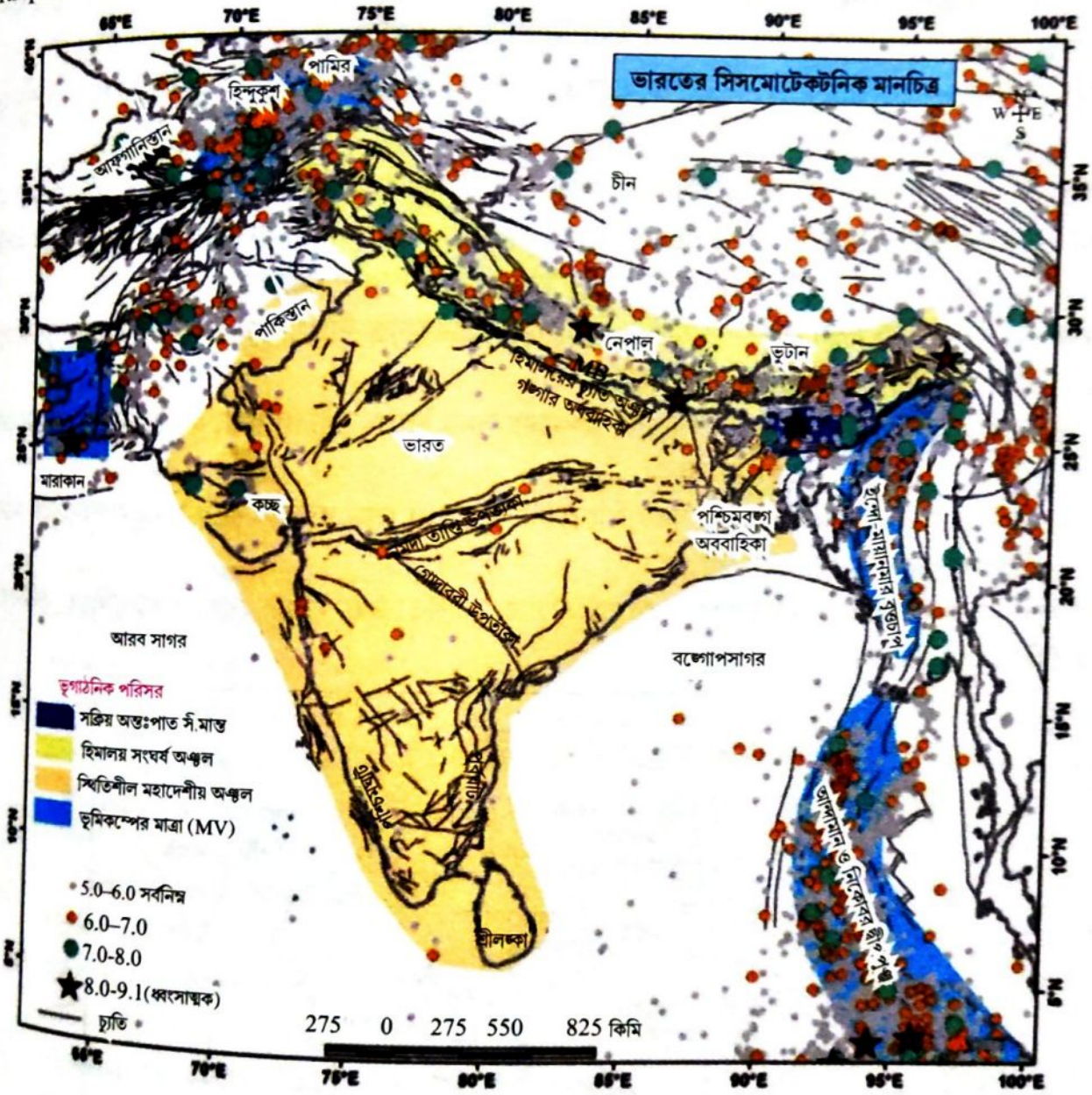

চিত্র 5.3 : ভূমিকম্পের Seismotechtonic মানচিত্র

প্রথমত, ভারতের নির্দিষ্ট সীমানাভিত্তিক অঞ্চলকে বেছে নেওয়া হয়েছে, যার সামগ্রিক বিস্তৃতি 5° উত্তর থেকে 40° উত্তর অক্ষাংশ এবং 65° ডিগ্রি পূর্ব থেকে 100° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত।

দ্বিতীয়ত, এরপর ভূগাঠনিক দিক থেকে চ্যুতি অঞ্চল, সক্রিয় অন্তঃপাত সীমান্ত, সংঘর্ষ অঞ্চল, স্থিতিশীল অঞ্চলগুলিকে ভূমিকম্পের ভিত্তিতে নিপুণভাবে প্রদর্শন করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, এরপর সংশ্লিষ্ট অঞ্চল জুড়ে ঘটা অতীতের বিভিন্ন সময়ের অনুভবযোগ্য ভূমিকম্পের বিভিন্ন মাত্রা অনুযায়ী তার উৎসস্থলগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে মানচিত্রটিতে ★ চিহ্ন দ্বারা সর্বোচ্চ মাত্রা বিশিষ্ট ভূমিকম্পের উৎসস্থলগুলি প্রদর্শিত হয়েছে।

3. Isoseismal Line Map : ভূপৃষ্ঠের কোনও অঞ্চলে সমান ভূকম্প তীব্রতার স্থানগুলিকে কোনো কাল্পনিক রেখা দ্বারা সংযুক্ত করা হলে, তাকে সমতীব্র ভূকম্পন রেখা বলা হয়। আর, যে বিশেষ মানচিত্রে এই সমতীব্র ভূকম্পীয় স্থানগুলিকে উপস্থাপন করা হয়, তাকেই Isoseismal Line Map বলা হয়ে থাকে।

প্রসঙ্গত, হাঙ্গেরিতে 1810 খ্রিস্টাব্দে ভূবিজ্ঞানী Mor কর্তৃক পৃথিবীতে প্রথম Isoseismal Line Map তৈরি করার প্রচেষ্টা শুরু হলেও, তা সফলভাবে প্রকাশিত হয় 1857 খ্রিস্টাব্দে Robert Mallet-এর প্রচেষ্টায়।

■ **কৌশল (Techniques) :** সাধারণত কোনো স্থানে ভূমিকম্প সৃষ্টি হওয়ার ঠিক পরেই ভূমিকম্পের Isoseismal Line Map তৈরি করা হয়। এর জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করতে হয়। যেমন—

(i) কোনো স্থানে ভূমিকম্প ঘটার পর সেখান থেকে ভূমিকম্পের মাত্রাগত বণ্টন সম্পর্কে বিশদ তথ্য আহরণ করতে হয়।

(ii) বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া তথ্যগুলিকে একটি নির্দিষ্ট সারণিতে সাজিয়ে তার যথার্থতা বিচার করা হয়।

(iii) এরপর Mercalli কিংবা Richter Scale-এ পাওয়া ভূমিকম্পের সমান তীব্রতার মাত্রাগুলিকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানচিত্রে নির্দিষ্ট কয়েকটি বিন্দুর মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা হয়।

(iv) এরপর নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পদ্ধতির দ্বারা সমান তীব্রতাযুক্ত বিন্দুগুলিকে ঘিরে কয়েকটি পৃথক পৃথক প্রায় বৃত্তচাপীয় রেখা অঙ্কন করা হয়।

(v) প্রতিটি ভূকম্পীয় সমতীব্রতা রেখাগুলি অঙ্কনের সময় বিশেষ খেয়াল রাখতে হয়, যাতে কোনো রেখাই যেন একে অপরকে ছেদ না করে।

(vi) সবশেষে পৃথক পৃথক মাত্রার রেখাগুলিতে নির্দিষ্ট রঙের শেড ব্যবহার করে সমভূকম্পনরেখা মানচিত্র উপস্থাপন করা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট সমভূকম্পন রেখামানচিত্রে প্রদর্শিত উচ্চ মাত্রার রেখা বলয়গুলিতে ভূমিকম্পের ঝুঁকি সর্বাধিক হয়ে থাকে।

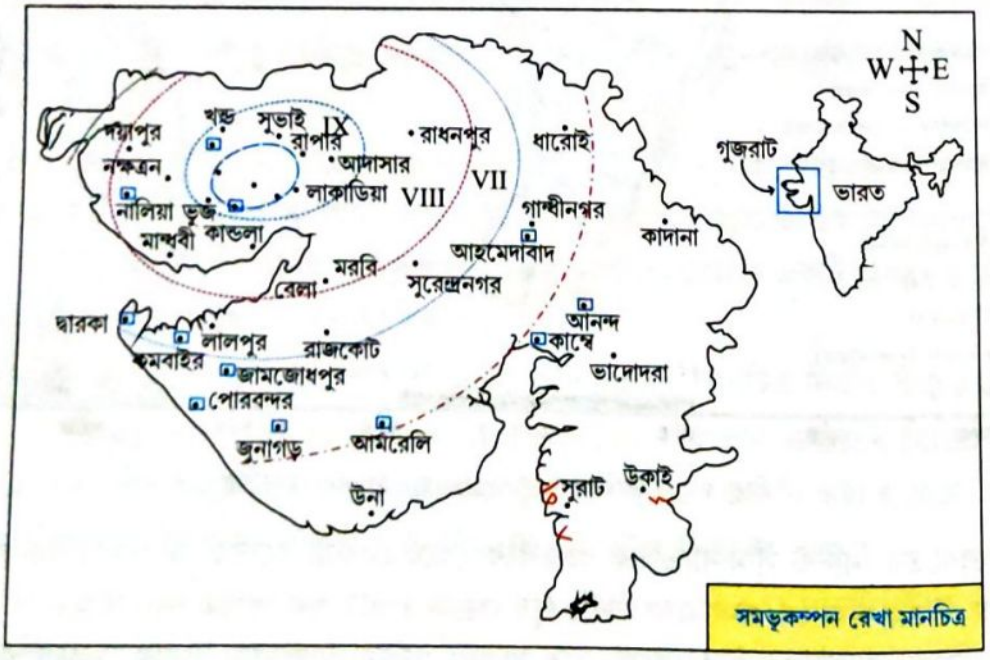

চিত্র 5.4 : গুজরাটের সমভূকম্পন রেখা মানচিত্র

4. Earthquake Belt Map or Earthquake Prone Area Map : কোনো স্থানে ভূমিকম্প প্রবণতার প্রকৃতি কীরূপ তা সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে Seismic Zone Map বা Earthquake Belt Map নির্মাণ করা হয়।

কৌশল (Techniques) : Seismic Zone Map বা Earthquake Belt Map প্রস্তুতের জন্য যে কয়েকটি কৌশল অবলম্বন করতে হয়, তা হল—

(i) প্রথমেই ভূমিকম্পপ্রবণ নির্দিষ্ট একটি অঞ্চল নির্ধারণ করতে হয়। এখানে সংশ্লিষ্ট মানচিত্র অঙ্কনে ভারতের যে নির্দিষ্ট পরিসরকে বেছে নেওয়া হয়েছে, তার সামগ্রিক বিস্তৃতি হল 8° উত্তর থেকে 38° উত্তর অক্ষাংশ এবং 68° পূর্ব থেকে 100° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত।

(ii) এরপর বিগত কয়েক দশকের মধ্যে ভারতে মোট যতগুলি ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রত্যেকটির উৎসস্থল এবং মাত্রা (Magnitude) সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। এখানে BIS কর্তৃক 1883 খ্রিস্টাব্দ থেকে 2002 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন ভূমিকম্পের অবস্থান এবং মাত্রা সংকলন করা হয়েছে।

(iii) ভূমিকম্পের বলয় মানচিত্র নির্মাণ করার জন্য কোনও একটি অঞ্চলকে নির্দিষ্ট অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ ভিত্তিক অসংখ্য গ্রিডে বিভক্ত করা হয়। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি গ্রিডের একক ক্ষেত্রফল যত ছোটো হবে, ততই অত্যন্ত নিখুঁতভাবে প্রতিটি ভূমিকম্পের উৎসস্থল গুলিকে লিপিবদ্ধ করা যাবে। আবার গ্রিডের ক্ষেত্রফল যদি খুব বড়ো হয়ে যায়, তাহলে ভূমিকম্পের উৎসস্থল গুলির অবস্থান প্রদর্শনে কিছুটা ত্রুটি আসতে পারে। সেক্ষেত্রে সমগ্র মানচিত্র প্রদর্শনে সাধারণিকরণ পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

(iv) এখানে বছরের বিভিন্ন সময় উৎপন্ন প্রতিটি ভূমিকম্পের মধ্যে সর্বোচ্চ মানগুলিকেই একক হিসাবে গ্রহণ করা হয়, যা ওই বছরটির ভূমিকম্পের 'Standard Maximum Observed Magnitude'-কে প্রতিনিধিত্ব করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি ভারতের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে বিগত 119 বছরে পৃথক পৃথকভাবে মোট যতগুলি ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে, তার মধ্যে প্রতি বছরের সর্বোচ্চ ভূমিকম্পের মাত্রাটিকেই এখানে প্রতিনিধিত্বকারী রূপে ধরা হয়।

(v) এরপর গ্রিডভিত্তিক বিভিন্ন বছরে মোট কতকগুলি অনুভবযোগ্য বা সর্বোচ্চ মাত্রার ভূমিকম্প ঘটল, তাকে পরিসংখ্যায়িত করতে হবে বা গুনতে হবে।

প্রসঙ্গত, ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেহেতু ভূমিকম্পের সমস্ত তথ্যগুলি স্থান-কাল অনুযায়ী প্রতি মিনিট, ঘণ্টা কিংবা দিন অনুযায়ী যে-কোনো সময়ই পরিবর্তিত হতে পারে, তাই এখানে গ্রিডভিত্তিক ভূমিকম্পের মাত্রা প্রদর্শনে বেশ কতকগুলি জটিল গাণিতিক কৌশলের সাহায্য নেওয়া হয়। এগুলি হল—**(a)** Time Series Analysis, **(b)** Seismic Zone Factors, **(c)** Basic Seismic Coefficient, **(d)** Average Acceleration Coefficient, **(e)** Earthquake Energy Intensity, **(f)** Regression Relation প্রভৃতি।

❐ সারণি-1 ❐

MM Scale-এ তীব্রতার প্রকৃতি	ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল
<V	Zone I
VI	Zone II
VII	Zone III
VIII	Zone IV
IX	Zone V

(vi) প্রসঙ্গত, ভূমিকম্পের মানচিত্রে উপকেন্দ্রগুলি প্রদর্শনে আমরা যদি দ্বিচলক রাশি ভিত্তিক Time Series Analysis Method-এর সাহায্য নিই, এখানে যে দুটি বিশেষ চলক (Variable) পাওয়া যাবে (যেমন—নির্দিষ্ট বছর এবং বছরভিত্তিক ভূমিকম্পের সর্বোচ্চ মাত্রা), তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে Least Square Method বা লঘিষ্ঠ বর্গ পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে। এক্ষেত্রে a এবং b নামক দুটি ধ্রুবক সংখ্যা যে সমীকরণের মাধ্যমে পাওয়া গেছে, তা হল—$\{\sum y = Na + b\sum x,\ \sum xy = a\sum x + b\sum x^2\}$. এখানে সংশ্লিষ্ট

সমীকরণের মাধ্যমে পাওয়া b মানটি হল Time series method-এর 'Regression Relation'-এ পাওয়া M1 বা 'Maximum Observed Magnitude' যা কোনো নির্দিষ্ট গ্রিডে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পের সর্বোচ্চ মান।

(vii) এইভাবে বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে পাওয়া সর্বোচ্চ intensity মাত্রার গড় মানগুলিকে বিভিন্ন গ্রিডে উপস্থাপন করার পর, প্রতিটি গ্রিডের মানের উপর নির্দিষ্ট ক্রমের 'Isopleth' অঙ্কন করলেই এক-একটি 'Earthquake Zone' পাওয়া যাবে।

(viii) সবশেষে "Earthquake Zone Map"-টিকে সম্পূর্ণ করার জন্য প্রতিটি 'Index zone'-কে "Shed" কিংবা রঙ প্রয়োগ করা হয়। 'Bureau of Indian Standard' ভারতের ক্ষেত্রে যে ভূমিকম্পপ্রবণ বলয় মানচিত্র প্রকাশ করে থাকে, সেখানে 'Modified Mercealli Scale (MM-Scale)"-এর ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পাঁচটি বিভিন্ন তীব্রতার অঞ্চল প্রদর্শন করে থাকে।

অবশ্য 2002 সালে ভারতের ভূমিকম্পের মানচিত্রে I এবং II নং zone-কে একত্রিত (Merge) করে মোট 4টি zone চিহ্নিত করা হয়েছে।

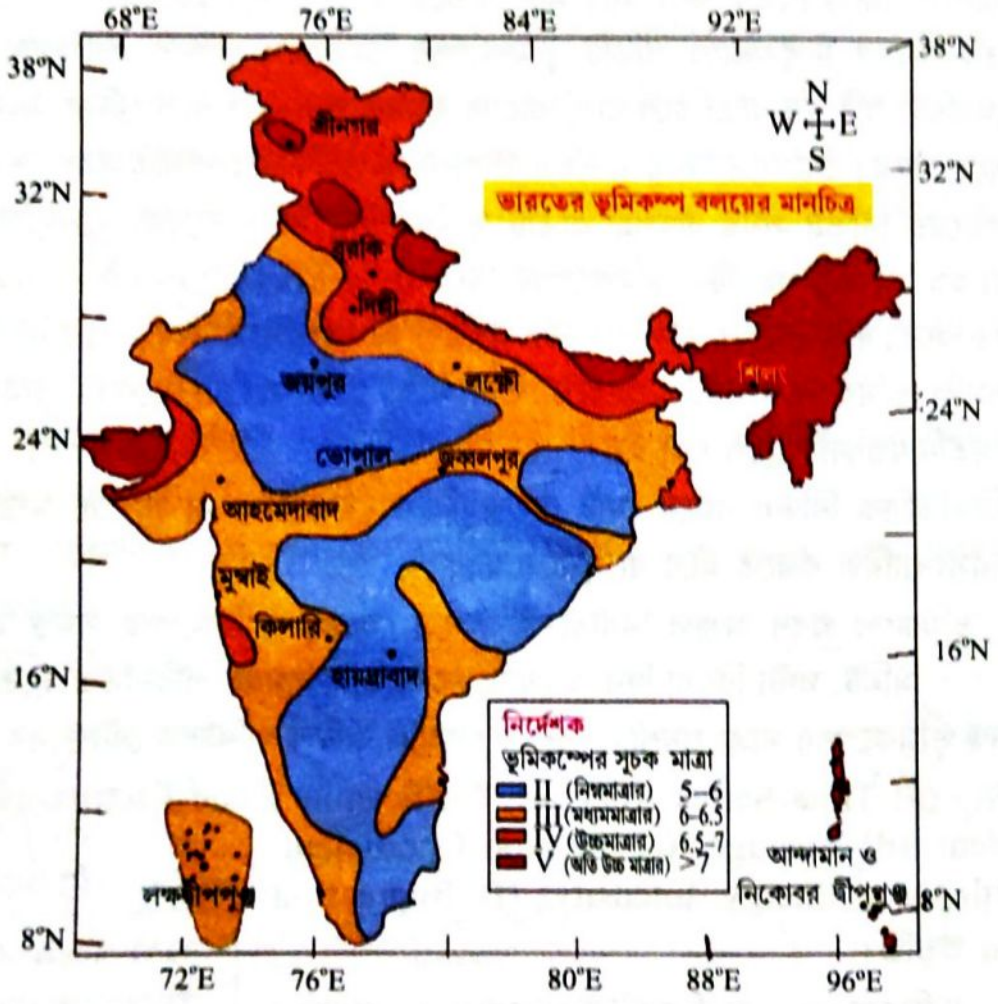

চিত্র 5.5 : ভারতের ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলের মানচিত্র

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঃ শ্রেণিবিভাগ, মোকাবিলার উপায়

1

(Natural Hazard : Classification, measures for mitigation)

মানুষের সভ্যতা প্রায় পাঁচ হাজার বছর পেরিয়ে এলেও প্রকৃতি-নির্ভরতাকে পুরোপুরি নির্মূল করতে পারেনি, অথবা প্রকৃতির অপার বৈচিত্র্য ও গভীরতাকে মানুষ সম্পূর্ণভাবে বুঝে উঠতেও পারেনি। তাই মাঝেমাঝেই ভয়ংকর বন্যা, খরা, ঝড়ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিধস, প্রভৃতির প্রকোপে মানুষ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এইসব ঘটনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আকস্মিক এবং দ্রুত প্রভাববিস্তারকারী, তাই সঠিক পূর্বাভাস বা উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা সম্ভব হয়ে ওঠে না এবং প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

অনেকক্ষেত্রেই মানুষের বিভিন্ন তথাকথিত উন্নয়নমূলক বা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, প্রকৃতিকে বশ মানানোর নানা প্রচেষ্টা এবং দূষণ এই ধরনের দুর্যোগকে ত্বরান্বিত করে।

দুর্যোগকে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

(1) কোনো বিপদের ঝুঁকি (Risk),

(2) বিঘ্ন (Hazard)

(3) ভয়ংকর বিপর্যয় (Disaster)

ধরা যাক, নদীর পাড়ে ভাঙন চলছে, গ্রামের মানুষের নদী-পাড়ের জমি একটু একটু করে নদী গ্রাস করে নিচ্ছে, যে-কোনো দিন পুরো গ্রামটিই ভেঙে নদীর গর্ভে চলে যেতে পারে, কিন্তু এখনও যায়নি। সরকারি/বেসরকারি উপায়ে প্রতি বছর দায়সারাভাবে পাড় বাঁধানোর চেষ্টা চলছে। এক্ষেত্রে সেই গ্রামের মানবিক ও প্রাকৃতিক সম্পদ আসন্ন বিপদের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

যদি ভূমিকম্প বা ভূমিধস ইত্যাদি ঘটার ফলে কোনো স্থানে আকস্মিকভাবে মানুষের জীবনযাত্রা ব্যাহত হয় এবং সম্পদের অল্পবিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়, সেক্ষেত্রে এলাকাটি বিঘ্ন (Hazard) পীড়িত বলতে হবে।

আবার যদি কোনো আকস্মিক টর্নেডো, সাইক্লোন বা সুনামি ঘটার ফলে অতি অল্পসময়ে বিস্তীর্ণ জায়গাজুড়ে অসংখ্য প্রাণহানি ঘটে, অন্যান্য প্রাকৃতিক পরিবর্তন হয় এবং ক্ষয়ক্ষতি পূরণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, তবে সেই ধরনের দুর্যোগকে ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা প্রলয় (disaster) বলা হয়।

প্রশাসনিক সদিচ্ছা ও উদ্যোগের অভাব, সাধারণ মানুষের সচেতনতা ও শিক্ষার অভাব, ধর্মভীরুতা ও নিয়তি-নির্ভর নিশ্চেষ্টতা, দুর্যোগ মোকাবিলায় যথেষ্ট শক্তি ও সম্পদের যোগানের অভাব— ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মানুষের বিপন্নতা বা vulnerability বাড়িয়ে দেয়। অর্থাৎ আসন্ন বিপদকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। বিপন্ন মানুষের সংখ্যা এবং অবৈজ্ঞানিকভাবে রক্ষিত সম্পদের পরিমাণ যত বেশি হবে বিপদের ঝুঁকিও ততই বাড়বে। এরপর বিপদ ঘটে গেলে অনেকক্ষেত্রে পূর্বাভাস থাকা সত্ত্বেও ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বিঘ্নের সীমা ছাড়িয়ে বিপর্যয়ে পরিণত হয়। উন্নয়নশীল বিশ্বে, অপরিকল্পিত উন্নয়ন, প্রচুর জনসংখ্যা, জীবনযাত্রার নিম্নমান, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, অত্যাবশ্যকীয় পরিসেবার ও জীবনদায়ী চিকিৎসার অপ্রতুলতা সহজেই জীবন ও সম্পদহানির পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং পৃথিবীর দুর্যোগপূর্ণ ঘটনার পরিসংখ্যান নিলে দেখা যায়, বিপর্যয়ের সংখ্যা, মাত্রা সবকিছুই এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বেশি ঘটেছে। অন্যদিকে উন্নত বিশ্বে দুর্যোগ মোকাবিলার উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রশাসনিক সদিচ্ছা থাকায়, খুব কম দুর্যোগই বিপর্যয়ে পরিণত হয়। দুর্যোগ বিষয়ক আন্তর্জাতিক রিপোর্টগুলিতে দেখা যায় যে 1970 থেকে 1995-এর মধ্যে এশিয়া মহাদেশের 123 মিলিয়ন মানুষ এবং আফ্রিকার 12 মিলিয়ন মানুষ ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কবলে পড়েছে।

গভীরভাবে খতিয়ে দেখতে গেলে বলা যায় যে, বিঘ্ন (hazard) এবং বিপর্যয় (disaster)-এর মধ্যে সীমারেখা টানা সহজ নয়।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সুনীলকুমার মুন্সীর (2007) মতে— 'Though our mega environment has been more or less stable, minor deviations from this normal state cause deviation in human adaptation. Such deviations in nature beyond normal expectation is generally called hazard.'

ভূমিরূপবিদ অধ্যাপক সাবিন্দ্র সিং (2001) -এর মতে— 'Hazards are generally taken to be the processes (causal factor) and the responses (Results) of extreme events, both natural and anthropogenic, which cause an accident/extreme events/or danger.'

অল্প কথায় বিঘ্ন বা hazard-এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(1) পরিবেশের সাম্যাবস্থা থেকে বিচ্যুতি যদি মানুষের জীবনযাত্রা ব্যাহত করে তবে তা হল বিঘ্ন বা hazard।

ছাত্রছাত্রীরা মনে রাখবে বিঘ্ন বা hazard শুধু যে মানুষের জীবনকেই প্রভাবিত করবে তা নাও হতে পারে, জীবজন্তু, গাছপালা, কীটপতঙ্গ—সংক্ষেপে জীবজগতের যে-কোনো অংশই বিঘ্নের ফলে বিপদে পড়তে পারে। সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহে ও বায়ুমণ্ডলে ঝড়ঝঞ্ঝা চলতে পারে। কিন্তু সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব নেই। তাই সেই ঘটনাগুলি কেবলমাত্র প্রাকৃতিক ঘটনার রকমফের। বস্তুত, পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব আছে বলেই স্বাভাবিক পরিবেশের যে-কোনো বিচ্যুতি প্রাণ বা প্রোটোপ্লাজমকে বিপদের সামনে দাঁড় করাতে পারে। তাই পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই ধরনের বিচ্যুতি বিঘ্ন বা hazard রূপে গণ্য হবে।

(2) বিঘ্ন বা hazard-এর উৎপত্তি এবং প্রভাবিত এলাকা, বিপর্যয়ের তুলনায়, অল্প আয়তন অধিকার করে। সুতরাং, বিপর্যয় বা disaster-এর তুলনায় hazard ক্ষুদ্র স্কেলে সংঘটিত হয়।

(3) যে-কোনো বিঘ্ন বা hazard-এর জন্য নানারকম প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদান পৃথকভাবে বা সংযুক্তভাবে দায়ী হতে পারে। সুতরাং এধরনের ঘটনা ঘটার পর প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক দু'ধরনের সম্পদই অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এবারে দেখা যাক, দেশবিদেশের নানা বিশেষজ্ঞ বিপর্যয় বা disaster-কে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

(a) ফ্রেডরিক ক্রিমগোল্ড (Fredrick Krimgold) 1976 সালে, তাঁর 'Overview of the priority area Natural Disaster' (United Nations, New York) বইতে বিপর্যয়ের সংজ্ঞা দেন এইভাবে— 'Disaster is a crisis event which outstrips the capacity of society to manage or cope with it at least for a time.'

(b) 1989 সালে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়— 'Disaster is an extraordinary event of limited duration or strictly speaking, a natural event causing serious disruption of country's economy.'

(c) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে— 'a disaster is any occurrence causing damage, ecological disruption, loss of human lives, deterioration of health and health services on a scale sufficient to warrant any extraordinary intervention from outside the affected community (Ref. Lazzari Stefano, 1990, Health aspects of disaster preparedness and response, WHO Health for all when a disaster

strikes, Vol. 2).

সহজ কথায় বিপর্যয় বা disaster-এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(a) বিপর্যয় আকস্মিক ও দ্রুত প্রভাব বিস্তারকারী।

(b) বিপর্যয়ে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদহানি ও বিপুল সংখ্যার মানুষের জীবনহানি হয়। তবে সম্পদ ও জীবনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ সহজ নয়। বিভিন্ন সময়, পরিস্থিতি ও দেশভেদে এই পরিমাপের পার্থক্য হয়। 2001 সালের World Disaster Report-এ বলা হয়— কোনো দুর্ঘটনা তখনই বিপর্যয় বলে গণ্য হবে যখন—

(1) দশ বা তার বেশি মানুষের মৃত্যু হবে।

(2) একশো বা তার বেশি মানুষ আহত হবে।

(3) পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে সাহায্যের দরকার হবে।

(4) সরকারিভাবে আপৎকালীন পরিস্থিতি ঘোষিত হবে।

আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকরা (Natural Hazard Research Group) ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে— কোনো দুর্ঘটনায় কমপক্ষে এক মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ সম্পদ হানি, অন্তত একশো মানুষের মৃত্যু এবং একশো মানুষ আহত হবে, তাকে বিপর্যয় বলা হবে (Basu, 2007)।

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), Belgium বড় বির্পযয়ের সংজ্ঞা দেন এইভাবে—

(1) অন্তত 100 মানুষের মৃত্যু হবে,

(2) দেশের জাতীয় GDP-এর এক শতাংশ বা তার বেশি পরিমাণে ক্ষতি হবে,

(3) দেশের মোট জনসংখ্যার এক শতাংশ বা তার বেশি আক্রান্ত হবে (Smith & Petley, 2007)।

দুর্যোগের সৃষ্টি

পরিবেশে দুর্যোগ সাধারণত তিনভাবে ঘটতে পারে—

(1) কেবলমাত্র প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা সংঘটিত দুর্যোগ (Natural Hazards)।

(2) প্রাকৃতিক শক্তি এবং মানুষের কার্যকলাপ উভয়েই যার জন্য দায়ী এমন দুর্যোগ (Quasi Natural Hazard)।

(3) কেবলমাত্র মানুষের অপরিণামদর্শিতার ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ (Manmade Hazards)।

ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, সুনামি প্রভৃতি দুর্যোগ কেবলমাত্র প্রাকৃতিক

11.1.1 বিপর্যয় নিয়ে দ্বিমত (Disagree with the disaster) :

বন্যার মতো নদীপাড় ক্ষয়ের বিষয়টিকে অনেক বিশেষজ্ঞই বিপর্যয় মানতে দ্বিধাগ্রস্ত রয়েছেন। কারণ বিগত দুই দশক আগেও পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে নদীপাড়ের ক্ষয়কে দুর্যোগ ধরাই হত না। বিশেষ করে কোনো কোনো ভৌগোলিক মনে করেন, নদী পাড়ের ভাঙা-গড়ার খেলাটি আসলে নদীপ্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনের সামঞ্জস্যবিধান মাত্র। সমস্ত নদীপাড় বিশ্লেষণেই দেখা গেছে, নদীর একদিকের পাড় যেমন ক্ষয়ের মাধ্যমে সংকীর্ণ হয়েছে, একইভাবে নদীর বিপরীত দিকের পাড়টি সঞ্চয়কার্যের প্রাধান্যে অত্যন্ত প্রশস্ত হয়ে উঠে পারস্পরিক ভারসাম্য সৃষ্টি করেছে।

চিত্র-11.2 : নদীপাড় ক্ষয়ের বিভিন্ন অবস্থা

তবে, সাম্প্রতিককালে বন্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতিটি নদী অববাহিকায় এই ধরনের পাড় ক্ষয় সংক্রান্ত দুর্যোগ যেভাবে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, তাতে সংশ্লিষ্ট এলাকার বহু গ্রাম বা শহর, চাষযোগ্য জমি, ভূসম্পত্তি পুরোপুরি নদীখাত বরাবর তলিয়ে গেছে। এমনকী এই ধরনের ঘটনাগুলিতে অসংখ্য মানুষ আক্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি, অনেকে প্রাণও হারিয়েছেন। এই সমস্ত ভয়াবহ বিপদের পরেও যে কয়েকজন মানুষ বেঁচে গেছেন, সেখানে তারা সহায়-সম্বলহীন হয়ে ক্রমশ বুভুক্ষু ভিখারিতে উপনীত হয়েছেন। সামগ্রিকভাবে মানুষের এই অসহায় পরিণতি দেখে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান নদীপাড় ক্ষয়কে দুর্যোগরূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশেষ করে 2015 খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার *International Federation of Red Cross and Red Crescent Society*-র প্রধান **Bob Macrow** নদীপাড়ের ক্ষয়কে **"Slow, Silent Disaster"** বলে আখ্যায়িত করেছেন।

11.1.2 নদীপাড় ক্ষয়ের মাত্রা (Dimension of riverbank erosion) :

যে-কোনো নদীর পাড় বরাবর ক্ষয়কার্যের মাত্রা তিন ধরনের হয়ে থাকে, যেমন—

(1) মস্তকমুখী ক্ষয় (Headward erosion) : নদীর মস্তকমুখী ক্ষয়কার্য মূলত নদীপ্রবাহের সামনের দিকগুলিতে ঘটে থাকে। এই ধরনের প্রভাবে নদী দৈর্ঘ্য ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। তবে, নদী-অববাহিকা অঞ্চলের অন্যান্য জলধারাও মস্তকমুখী ক্ষয় করে নদীপাড়গুলিকে বিধ্বস্ত করে। সাধারণত যে সমস্ত নদ-নদীর জলধারণ ক্ষমতা যত বেশি, তার মস্তকমুখী ক্ষয়ের মাত্রাও তত বেশি। অনেক সময় অধিক মস্তকমুখী ক্ষয় প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে নদীগ্রাস (River capture)-এর মতো ঘটনা ঘটে, যা নদীপাড় ভাঙনের সম্ভাবনা আরও বাড়িয়ে দেয়।

চিত্র-11.3 : নদীপ্রবাহের দ্বারা মস্তকমুখীক্ষয়

(2) **উল্লম্ব ক্ষয় (Vertical erosion) :** নদীপাড়ের উল্লম্ব ক্ষয় সর্বাধিক পরিমাণে লক্ষ করা যায় নদীর উচ্চগতিতে। এখানে ভূমির ঢাল সবচেয়ে বেশি থাকে বলে, নদীর প্রবল শক্তি উল্লম্ব ক্ষয়ে সহায়ক হয়ে ওঠে। কোনো নদীতে উল্লম্ব ক্ষয়ের মাত্রা বেশি থাকলে, নদীপাড়ের সর্বোচ্চ অংশ এবং নদীখাতের সর্বনিম্নাংশের মধ্যে উচ্চতাগত ব্যবধান ক্রমশ বাড়তে থাকে।

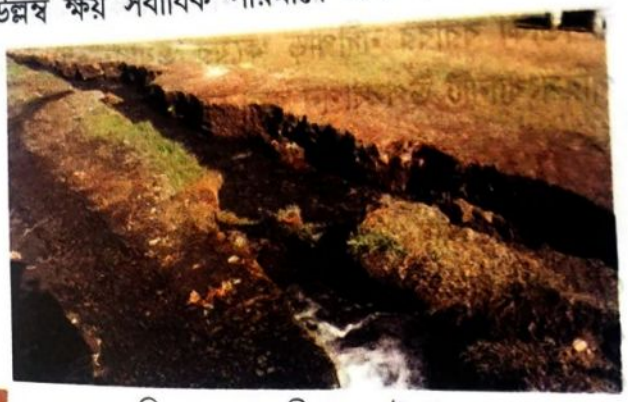

চিত্র-11.4 : নদীপাড়ের উল্লম্ব ক্ষয়

চিত্র-11.5 : নদীপাড় বরাবর উল্লম্ব এবং পার্শ্বীয় ক্ষয়

(3) **পার্শ্বীয় ক্ষয় (Lateral erosion) :** পৃথিবীর প্রায় সমস্ত নদী-অববাহিকায় পার্শ্বীয় ক্ষয়প্রবণতাই সবচেয়ে বেশি দুর্যোগের সৃষ্টি করে থাকে। নদীর মধ্য এবং নিম্ন গতি প্রবাহে এই ধরনের পার্শ্বীয় ক্ষয়ে পার্শ্ববর্তী জনপদগুলিকে ক্রমশ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

11.1.3 নদীপড় ক্ষয়ের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of River Bank Erosion) :

নদীপাড় ক্ষয়ের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(i) নদী অববাহিকা অঞ্চলে ভূমিগ্রাস এবং ভূমিধসের একটি সমন্বয়ী রূপ হল নদীপাড়ের ক্ষয়।

(ii) নদীখাত এবং পাড় মধ্যস্থ শিলাস্তর বরাবর স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক পীড়ন নদীপাড় ক্ষয়ে কার্যকরী হয়।

(iii) নদীপাড় ক্ষয়ের নিয়ত প্রক্রিয়া বছরের প্রায় সমস্ত সময় ধরেই কমবেশি চলতে থাকে।

(iv) অনেকসময় নদীপাড় ক্ষয় এত ধীরগতিতে ঘটে, যাকে খালি চোখে সহজে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

(v) নদীপাড় ক্ষয়ে নদীর গতিপথের ভাঙা-গড়ার ভারসাম্য বজায় থাকলেও, জনজীবনের নিরিখে এটি একটি দুর্যোগবহুল প্রতিকূল পরিস্থিতি।

(vi) মানুষের বাসস্থান ও জীবিকাসংস্থানের দিক থেকে নদীপাড় ক্ষয় একটি সার্বিক 'কীর্তিনাশা' প্রক্রিয়া।

(vii) নদীপাড় ক্ষয়ের ফলে নদীখাতগুলি আয়তনে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে জনবসতি অঞ্চলের দিকে সরে যায়।

➢ ***দৃষ্টান্ত (Example) :*** আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম একটি নদীপাড় ক্ষয় বিধ্বস্ত দেশ। এদেশে বিগত চার দশকে প্রায় 71,610 হেক্টর জমি নদীগর্ভে চলে গেছে, যা এখানকার একটি গোটা জেলার প্রায় সমান। ভারতের বেশ কিছু অঞ্চলেও নদীর পাড়গুলি বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময় ধরে ব্যাপক ক্ষয়ের কবলে পড়ে। বিশেষ করে, পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় উপত্যকায় ক্ষয়ের ঘটনায় প্রতিবছর প্রায় অসংখ্য মানুষ চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়। এখানকার নদীপাড় ক্ষয়ে বিপর্যস্ত কয়েকটি জেলা হল—মালদহ, মুরশিদাবাদ, হুগলি, হাওড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি। এ ছাড়াও ভারতের অপর একটি উল্লেখযোগ্য নদীপাড় ক্ষয় বিধ্বস্ত অঞ্চল হল অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা।

❐ সারণি-1 : ব্রহ্মপুত্র নদের পাড় ক্ষয় সমীক্ষা ❐

সমীক্ষার সময়কাল	ক্ষয়প্রাপ্ত ব্রহ্মপুত্র নদী অববাহিকার আয়তন
1. প্রথম সমীক্ষা (1912-28)	3,870 Km^2
2. দ্বিতীয় সমীক্ষা (1963-75)	4,850 Km^2
3. তৃতীয় সমীক্ষা (2006)	6,080 Km^2

Source : NESAC

সরাসরি নদীপাড় ক্ষয়ে প্রভাব বিস্তার করে। যেমন—আর্দ্র ঋতুতে অধিক জলপ্রবাহ নদীপাড় ক্ষয় বৃদ্ধি করে।

(5) **নদীর বোঝা (River load) :** নদীর অতিরিক্ত বোঝা পরোক্ষভাবে নদীর শক্তি বৃদ্ধি করে নদীপাড় ক্ষয়ে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

(6) **শিলার প্রকৃতি (Nature of rock) :** নদীপাড়-মধ্যস্থ শিলার কাঠিন্যতা (hardness) বা কোমলতা (softness) সরাসরি নদীপাড় ক্ষয়কে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যেমন—কোমল শিলাস্তর গঠিত নদীপাড়গুলি কঠিন শিলাস্তরের নদীপাড়ের চেয়ে দ্রুত এবং অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত পায়।

(7) **নদী বাঁক (Meandeing) :** নদী যখন অধিক বাঁক-বিশিষ্ট হয়, তখন পাড়গুলিতে নদীপ্রবাহের জল বেশি পরিমাণে বাধা পায়, যা নদীপাড় ক্ষয়কে ত্বরান্বিত করে।

চিত্র-11.10 : নদীপাড়ের বিভিন্ন প্রকৃতি এবং ক্ষয়ের মাত্রা

প্রসঙ্গত, 1998 খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত নদী বিশেষজ্ঞ **Kinghton** নদীপাড় ক্ষয়ে সহায়তাকারী যে কয়েকটি বিশেষ উপাদানকে চিহ্নিত করেছেন, সেগুলি হল—

(i) ***নদীখাতের জ্যামিতি (Geometry of riverbed) :*** যেমন—নদীর গভীরতা, নদীখাতের ঢাল, নদীখাতের বিস্তৃতি, বাঁকের বক্রতার পরিমাণ, নদীপাড়ের উচ্চতা ও কৌণিক পরিমাণ প্রভৃতি।

(ii) ***প্রবাহের প্রকৃতি (Nature of stream) :*** যেমন—নদীর জলপ্রবাহের মাত্রা, জলধারার বিস্তৃতি, ঘূর্ণিসৃষ্টি, জলের আন্দোলন, জলনির্গমনের সময়গত পার্থক্য প্রভৃতি।

(iii) ***জলবায়ু (Climate) :*** যেমন—বৃষ্টিপাতের স্থায়িত্ব, ঘনত্ব, বণ্টন, শীতলীকরণ হার, উষ্ণতা-আর্দ্রতাভিত্তিক চক্র প্রভৃতি।

(iv) ***উপপৃষ্ঠীয় অবস্থা (Surface condition) :*** যেমন—পৃষ্ঠপ্রবাহের প্রকৃতি, পৃষ্ঠপ্রবাহের চাপ, মাটির আর্দ্রতাগত মাত্রা, জলসরবরাহের ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি।

(v) ***জৈবিক প্রভাবক (Organic factors) :*** যেমন—উদ্ভিদের আস্তরণ ও তার ঘনত্ব, মৃত্তিকাস্থিত প্রাণীদের অবস্থান, মানবীয় কার্যাবলি প্রভৃতি।

11.1.6 নদীপাড় ক্ষয়ের কারণসমূহ (Causes of riverbank erosion) :

নদীপাড় ক্ষয়ের পরিস্থিতির জন্য একাধিক প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট কারণকে দায়ী করা যায়, এগুলি হল—

❐ প্রাকৃতিক কারণসমূহ (Natural Causes)

1. **জলপ্রবাহের প্রকৃতি (Nature of streams) :** প্রাথমিকভাবে নদীপাড় ক্ষয়ের অন্যতম কারণরূপে নদী শক্তির মাত্রাগত প্রকৃতি বিশেষভাবে জড়িত। প্রতিটি নদীখাত সংলগ্ন অঞ্চলে জলপ্রবাহের একটি নির্দিষ্ট বেগ বা স্বাভাবিক মাত্রা থাকে। কিন্তু কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে এই জলপ্রবাহ অস্বাভাবিক আকার ধারণ করলে, জলের প্রবল আঘাত সংশ্লিষ্ট নদীপাড়গুলিকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

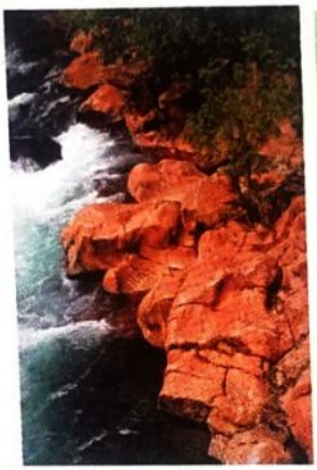

চিত্র-11.11 : নদীপাড়ের জলপ্রবাহ ক্ষয়

প্রসঙ্গত, নদীখাতে অতিরিক্ত জলপ্রবাহ নদীপাড়ে যে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে, তা সহ্য করতে না পেরে পাড়ের দুর্বল অংশগুলিতে একাধিক ছোটো ছোটো ফাটল সৃষ্টি হয়। এই ফাটলগুলি আয়তনে ক্রমশ বেড়ে নদীপাড়ের ক্ষমতাকে যখন বিনষ্ট করে দেয়, যখন শেষপর্যন্ত পাড়ের দুর্বল অংশগুলি নদীতে খসে পড়ে। অনেক সময় দেখা যায়, খসে পড়া পাড়ের অংশ নদীখাতে ক্রমান্বয়ে জমতে থাকলে, তাতে জল ধাক্কা খেয়ে সাময়িক ঘূর্ণিতে পরিণত হয়, যা নদীপাড়ের ক্ষয়ের মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

2. **জলবায়ুগত প্রভাব (Climatic factors) :** নদীপাড় ক্ষয়ের ক্ষেত্রে জলবায়ুগত প্রভাবকগুলি সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বিশেষ করে, কোনো নদী-অববাহিকা অঞ্চলে যদি অধঃক্ষেপণের পরিমাণ বেড়ে যায়, তাহলে বৃষ্টিপাত বা তুষারগলা জল একাধিক ছোটো ছোটো খাতে বিভক্ত হয়ে পাড়ের মধ্য দিয়ে নদীতে গিয়ে মেশে। এর ফলে নদীপাড়গুলি দ্রুত ধুয়ে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন—প্রতিবছর বর্ষাঋতুতে ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকায় এই কারণে নদীপাড় ক্ষয়ের মাত্রা দ্বিগুণ হয়ে যায়।

3. **নদীর প্রকৃতি (Nature of river) :** আমরা আগেই জেনেছি, নদীপাড় ক্ষয়ে নদীর প্রকৃতিগত উপাদানগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এখানে নদীর প্রকৃতি সংক্রান্ত যেসমস্ত বিষয় নদীপাড় ক্ষয়ে সরাসরি প্রভাব ফেলে, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল।
   - (i) নদীখাত অগভীর এবং মসৃণ হলে প্রবাহিত অতিরিক্ত জলের ধাক্কাকে নদীখাত প্রতিহত করতে পারে না, ফলে পাড় ক্ষয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। যেমন—বিহারের কোশি নদী অববাহিকায় এই অবস্থা দেখা যায়।
   - (ii) যে সমস্ত নদীতে অসংখ্য অবতল বাঁক রয়েছে, নদীজল তাতে বাধা পেয়ে ঘূর্ণির আকারে নদীপাড় ক্ষয়ে অংশ নেয়। যেমন—গঙ্গা মুরশিদাবাদের কাছ থেকে প্রবেশ করার পর যে অসংখ্য বাঁক সৃষ্টি করেছে, তার প্রভাবে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে ব্যাপক নদীপাড় ক্ষয় ঘটতে দেখা যায়।
   - (iii) নদীবক্ষে যদি একাধিক চরের উপস্থিতি থাকে, তাহলে চরগুলিতে নদী প্রবাহ বাধা পেয়ে ক্ষয়কারী

শক্তিকে আরও বাড়িয়ে দেয়। যেমন—অসমের ব্রহ্মপুত্র নদে এই ধরনের ক্ষয়প্রবণতা সর্বাধিক হারে লক্ষ করা যায়।

(iv) নদীপাড়গুলি যদি কোমল শিলায় গঠিত হয়, তাহলে নদীপাড় দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যেমন—কোমল শিলায় গঠিত উত্তর ভারতের অধিকাংশ নদীপাড় এই কারণে যথেষ্ট ক্ষয়গ্রস্ত।

(v) নদীর যত পরিণতি প্রাপ্তি ঘটে, ততই নদীখাতের বক্রতা, প্রশস্ততা, জলের পরিমাণ, এমনকি জলের বোঝার পরিমাণ অত্যন্ত বেড়ে যায়। সম্মিলিত এই প্রত্যেকটি পরিস্থিতিই নদীপাড়ের ক্ষয়ের মাত্রাকে যথেষ্ট বাড়িয়ে দেয়। যেমন—গঙ্গার মোহনা সংলগ্ন অংশের নদীপাড় ক্ষয়ে উল্লিখিত পরিস্থিতি বিশেষভাবে দায়ী।

4. ভূতাত্ত্বিক গঠন (Geological structure) : নদী-অববাহিকা অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক গঠন নদীপাড় ক্ষয়ের সম্ভাবনা তৈরি করে। সাধারণত যদি কোনো নদীপাড় ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে অস্থিতিশীল হয়, বিশেষ করে সেটি দারণ, চ্যুতিবিশিষ্ট, প্রবেশ্য কিংবা আলগা প্রকৃতির গঠন বিশিষ্ট হয়, তাহলে পাড়টির ক্ষয়প্রতিরোধ ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পায়। এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট নদীপাড়টি ক্রমাগত জলের আঘাতে বিধ্বস্ত হয়ে কোনও একসময় নদীখাত বরাবর ধসে পড়ে।

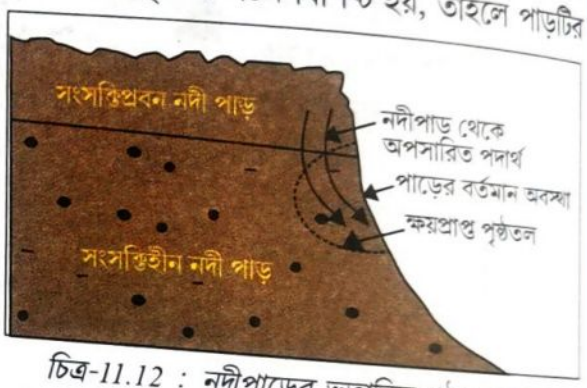

চিত্র-11.12 : নদীপাড়ের ভূতাত্ত্বিক গঠন ও ক্ষয়ের পৃষ্ঠতল

5. মৃত্তিকার প্রকৃতি (Nature of soil) : মাটির প্রকৃতির সঙ্গে ভূমিক্ষয়ের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সাধারণত নদীপাড় মধ্যস্থ মাটির গ্রথন যদি দুর্বল হয়, বিশেষ করে মাটি আলগা, ভঙ্গুর বা ছিদ্রযুক্ত কোমল প্রকৃতির হলে—জলের দ্বারা তার বিকৃতি দ্রুত ঘটে থাকে। এই ধরনের বিকৃত মাটি নদীপাড়ের দ্রুত ক্ষয় ঘটিয়ে পাড়ের ভারসাম্য বিঘ্নিত করে। যেমন—নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকার দুর্বল শিলায় গঠিত নদীপাড়গুলি প্রবল বর্ষায় দ্রুতহারে ক্ষয় পেয়ে থাকে।

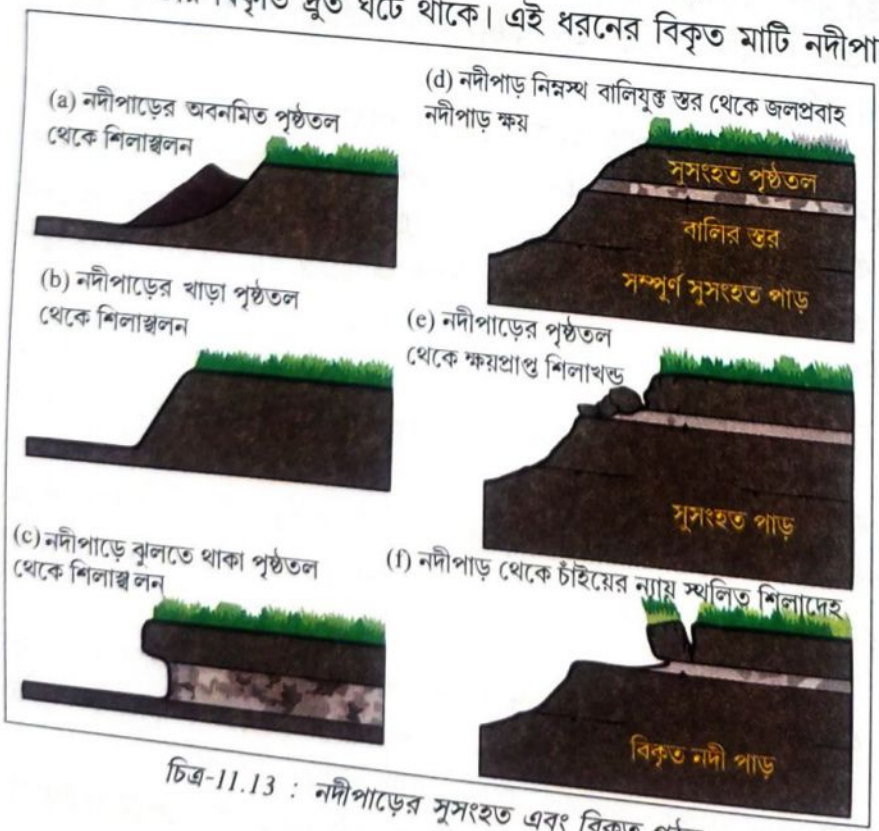

চিত্র-11.13 : নদীপাড়ের সুসংহত এবং বিকৃত গঠন

6. উদ্ভিদের স্বল্পতা (Lack of Vegetation) : সাধারণত উদ্ভিদের শিকড় মাটিতে আঁকড়ে ভূমিক্ষয়কে প্রতিরোধ করে থাকে। কিন্তু নদীপাড় সংলগ্ন অঞ্চলে উদ্ভিদের পরিমাণগত অভাব থাকলে, মাটি অসংলগ্ন অবস্থায় রয়ে যায়, ফলে নদীপাড়ের ক্ষয়ের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।

এ ছাড়াও, যে সমস্ত নদীপাড় প্রতিনিয়ত ঘূর্ণিঝড় বা সুনামির সম্মুখীন হয়, তার ক্ষয়ের মাত্রা উল্লিখিত সমস্ত ঘটনাগুলিকে ছাপিয়ে যায়।

❐ মনুষ্যসৃষ্ট কারণসমূহ (Man-made Causes)

নদীপাড় ক্ষয় যে শুধু প্রাকৃতিক কারণে ঘটে তেমনটা নয়, বেশ কিছু মনুষ্যসৃষ্ট কারণও নদীপাড় ক্ষয়ে সরাসরি জড়িত। এগুলি হল—

1. **জনবসতির বিস্তার (Settlements expansion) :** নদীপাড় ক্ষয়ের মনুষ্যসৃষ্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল নদীপাড় সংলগ্ন অঞ্চলে অবৈজ্ঞানিক প্রথায় জনবসতির বিস্তার। পৃথিবীতে অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং স্থান সংকুলানের অভাবকে দোহাই দিয়ে মানুষ প্রতিনিয়ত অপরিকল্পিতভাবে নদীপাড় বরাবর বসতি নির্মাণ করে চলেছে। এর ফলে নদীপাড়ের ওপর চাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে ক্ষয়সংক্রান্ত দুর্যোগকে অনিবার্য করে তুলেছে।

চিত্র 11.14 : নদী তীরবর্তী অঞ্চলে ভূমিব্যবহার

2. **কৃষিকাজ(Agriculture) :** সাধারণত নদী-তীরবর্তী অঞ্চলগুলি ফসল ফলানোর উপযোগী উর্বর পলিমাটি সমৃদ্ধ হওয়ায়, এখানে ব্যাপকভাবে কৃষিকাজ করা হয়ে থাকে। কৃষিকাজকে কেন্দ্র করে অনিয়ন্ত্রিত ভূমিকর্ষণ, জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, মাটি কেটে জমিতে আল দেওয়া প্রভৃতি কারণগুলি নদীপাড় ক্ষয়ের সম্ভাবনাকে অত্যন্ত বাড়িয়ে দেয়।

3. **অবৈধ নির্মাণ (Illegal construction) :** বেশির ভাগ নদীপাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবেষ্টিত স্থানগুলিতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা পিকনিক স্পটকে কেন্দ্র করে একাধিক হোটেল বা লজ, রাস্তাঘাট অবৈধভাবে নির্মাণ করা হয়। এই সমস্ত অবৈধ নির্মাণকাজ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে যে ভয়াবহ নদীপাড় ভাঙনের পরিস্থিতি তৈরি করে, তার অনিবার্য ফল ভুগতে হয় সংশ্লিষ্ট নদীপাড়ে থাকা জনবসতিগুলিকে।

4. **বনভূমি বিনাশ (Deforestation) :** নদীপাড় বরাবর রাস্তাঘাট নির্মাণ, নতুন বসতি বা দোকানবাজার নির্মাণ, কাষ্ঠ সংগ্রহ প্রভৃতির ফলে প্রচুর পরিমাণে বনভূমি বিলোপ করা হয়। এর ফলে নদী পাড়-সংলগ্ন মাটি ক্রমশ আলগা হয়ে গিয়ে ক্ষয়ের মাত্রা যথেষ্ট বৃদ্ধি করে।

5. **পশুচারণ (Grazing) :** নদীপাড় বরাবর অতিরিক্ত পশুচারণের ফলে সেখানকার মাটিতে ছোটো ছোটো গর্তের সৃষ্টি হয়। এই গর্তগুলিতে জল জমতে থাকলে সেগুলি আয়তনে বেড়ে যায় এবং কালক্রমে পাড়ে ফাটল ধরায়। সেই ফাটলগুলিই জলধারার ক্রমাগত আঘাতে একসময় নদীবক্ষ বরাবর স্খলিত হয়।

6. **শিল্পজাত বর্জ্য (Industrial wastages) :** অধিকাংশ শিল্প-কারখানাগুলি বড়ো বড়ো নদী-তীরবর্তী অঞ্চল বরাবর গড়ে ওঠে। এই সমস্ত শিল্পকেন্দ্রগুলির উৎপন্ন বর্জ্যের অনেকটাই নদীপাড়গুলিতে ফেলা হয়। এর ফলে নদীপাড় সংলগ্ন স্থানগুলির মাটির দৃঢ়তা নষ্ট করে দিয়ে ক্ষয়ের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

7. **স্নানের ঘাট (Bathing ghat) :** পৃথিবীর অধিকাংশ নদী-তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষ তাদের বিভিন্ন নিত্যক্রিয়া (শৌচ কর্ম, স্নান, জামা কাপড় কাচা প্রভৃতি) সম্পন্ন করার জন্য, নদীপাড় বরাবর অস্থায়ী স্নানের ঘাট বেঁধে থাকে। এর প্রভাবে নদীপাড়ের ক্ষয়ের মাত্রা যথেষ্ট হারে বৃদ্ধি পায়। যেমন—গঙ্গার উভয় পাড়ে এই ধরনের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

11.2 নদীপাড় ক্ষয়ের বিপন্নতা (Vulnerability of riverbank erosion) :

নদীপাড় ক্ষয়ের সমস্যাটি পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মহাদেশেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। প্রতিদিন একটু একটু করে ঘটতে থাকা নদীপাড়ের ক্ষয় মানুষকে একাধিক বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে তাদের সহায়সম্বলহীন করে তোলে। নদীপাড় ক্ষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মানবজীবনের এই ধরনের বিপন্নতা একাধিক কারণে নেমে আসে, যেমন—

প্রথমত, সভ্যতা গঠনের শুরু থেকেই বসতি নির্মাণের কেন্দ্রস্থলরূপে মানুষ নদী-তীরবর্তী স্থানগুলিকে বেছে নিয়েছিল। তাই মানুষের বাসস্থানের পরিসরটিতে এই নদীপাড় ক্ষয়ের বিপন্নতা সর্বাধিক গ্রাস করেছে।

দ্বিতীয়ত, প্রায় সমস্ত নদী-তীরবর্তী অঞ্চলগুলি হল চাষাবাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুকূল স্থল। মানুষের খাদ্য উৎপাদনের জন্য এই এলাকাটির ওপর অধিক নির্ভরশীলতা অনেকক্ষেত্রে বিপন্নতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয়ত, মানুষ নদীপাড়ের আশেপাশের অঞ্চলকেই জীবিকানির্বাহের জন্য বেছে নেয়। কিন্তু প্রতিনিয়ত নদীপাড় ভাঙন সংক্রান্ত পরিস্থিতি মানুষের জীবিকাগত ক্ষেত্রটিকেও বিপন্ন করে তোলে।

কাজেই যেখানে মানুষের জীবন ও জীবিকা সার্বিকভাবে বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়, সেখানে বিপন্নতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। নদীপাড় ক্ষয়ের পৃথিবীব্যাপী বিপন্নতার প্রতিচ্ছবি নিম্নলিখিত বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্তে আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

(i) কোনো ভূখণ্ডকে নদী একবার যদি গ্রাস করে ফেলে, তাকে পূর্বের অবস্থায় পুনরায় ফিরিয়ে আনা কখনোই সম্ভব হয় না।

(ii) সমস্ত দুর্বল নদীপাড় এলাকা বরাবর দীর্ঘকাল ধরে অনবরত ক্ষয়ের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে।

(iii) সমগ্র পৃথিবীর স্থলভাগের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রতি বছর গড়ে 26·4 বিলিয়ন টন মাটির অপসারণ ঘটে থাকে, যার সিংহভাগই নদীপাড় ক্ষয়ের সঙ্গে জড়িত।

(iv) নদীপাড় ক্ষয়ের প্রভাবে পৃথিবীব্যাপী প্রায় কয়েকহাজার মানুষ তাদের বসতি অঞ্চল থেকে বিচ্যুত হয়।

(v) পৃথিবীর আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলভিত্তিক নদীপাড় ক্ষয়ের গড় হার 30-60 বর্গকিমি/বছর।

(vi) পৃথিবীর যাবতীয় দেশের মধ্যে নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদীপাড়ের ক্ষয়ের মাত্রা সর্বাধিক। বিগত তিরিশ বছর ধরে বাংলাদেশ যে পরিমাণ জমি নদীপাড় ক্ষয়ের মাধ্যমে হারিয়েছে, তার মোট পরিমাণ সেখানকার একটা বড়ো জেলার মোট আয়তনের সমান।

(vii) ভারতের গঙ্গা নদীর ধারণ-অববাহিকার 1·09 মিলিয়ন বর্গকিমি স্থানের প্রায় 15-20% এলাকা সর্বাধিক ক্ষয়প্রবণ।

(viii) নদীপাড় ক্ষয়ের জন্য ভারতের শুধুমাত্র অসম উপত্যকা বিগত কয়েক দশকে তার মোট ভূখণ্ডের প্রায় 7·4% অংশ হারিয়েছে।

(ix) নদীপাড় ক্ষয়ের প্রভাবে পৃথিবীর মোট কৃষিজমির প্রায় 2-5% ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(x) ক্রমাগত নদীপাড় ক্ষয়ের পরিস্থিতি পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি করে থাকে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, চিন, ব্রাজিল প্রভৃতি।

11.2.1 মহাদেশভিত্তিক ক্ষয় প্রবণতা ও বিপন্নতা (Continent-based erosional tendency and vulnerability) :

বিভিন্ন মহাদেশভিত্তিক নদীপাড়ের ক্ষয় প্রবণতাকে নিম্নলিখিত আলোচনায় উপস্থাপন করা হল।

✪ **এশিয়া (Asia)** : নদীপাড় ক্ষয়ের দিক থেকে পৃথিবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ মহাদেশ হল এশিয়া। সমগ্র মহাদেশটিতে অসংখ্য নদনদী বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকলেও, এখানকার দক্ষিণ-পূর্বভাগেই নদীপাড় ক্ষয় সর্বাধিক হারে লক্ষ করা যায়। কারণ মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের দ্বারা প্রভাবিত এই অংশটি সক্রিয় একটি আর্দ্র অঞ্চল। তাই ঋতুভিত্তিক অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে, এখানকার নদীগুলিতে যেমন জলের জোগান যথেষ্ট বেড়ে যায়, একইভাবে ভূপৃষ্ঠ প্রবাহের সর্বাধিক মাত্রা নদীপাড় ভাঙনে অতি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

দশম অধ্যায়

ভূমিকম্প
(Earthuake)

A. সংজ্ঞা (Definition):-

ভূপৃষ্ঠের হঠাৎ কেঁপে ওঠাকে ভূমিকম্প বলে। ভূপৃষ্ঠে কখনো মৃদু স্পন্দন অনুভূত হয়, আবার কখনো প্রচন্ড ঝাঁকুনির সৃষ্টি হয়। এই কম্পন বা ঝাঁকুনি মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয়। তবে এটি বিরতিসহ একাধিকবারও অনুভূত হতে পারে। ভূত্বক থেকে আকস্মিক শক্তি মুক্তির ফলে সৃষ্ট ভূকম্পীয় তরঙ্গের ফলস্বরূপ ভূমিকম্প অনুষ্ঠিত হয়। ভূমিকম্প কার্মকান্ড বলতে কোনো এলাকায় একটি সময়কালে ভূমিকম্প সংঘটন সংখ্যা, ধরন ও আকারকে বোঝায়। বর্তমানে অবশ্য ভূমিকম্প বলতে ভূকম্পীয় তরঙ্গের উৎসকে (Source of seismic wave) বোঝানো হয়, ভূপৃষ্ঠের কম্পনকে নয়। কারণ ভূপৃষ্ঠের কম্পন ভূকম্পীয় তরঙ্গেরই ফল। ভূমিকম্প প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উভয় প্রকারই হতে পারে।

সাধারণভাবে ভূ-অভ্যন্তরে সৃষ্টি হওয়া কোনো গোলযোগ বা আলোড়নের ফলে পৃথিবীর কঠিন ভূত্বক কয়েক মুহূর্ত কিছু সময়ের জন্য হঠাৎ কেঁপে ওঠে বা আন্দোলিত হয়, একে ভূমিকম্প বলে। ভৌগোলিক *A. N. Strahler* ও *A. H. Strahler* -এর ভাষায় *"An Earthquake is a vibration or, oscillation of the surface of the earth caused by a transient disturbance of the elastic or gravitational equilibrium of the rocks at or beneath the surface."* অর্থাৎ, ভূপৃষ্ঠের নিকটে বা ভূ-অভ্যন্তরে শিলাস্তরের স্থিতিশীলতা বা অভিকর্ষজ ভারসাম্য কোনো কারণে বিঘ্নিত হলে ভূত্বকে যে কম্পন বা দোলন সৃষ্টি হয়, তাকে ভূমিকম্প বলে।

B. ভূমিকম্পের কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র (Focus and Epicentre of Earthquake):

◆ **ভূমিকম্পের কেন্দ্র (Earthequake Hypocentre):** পৃথিবীর ভূগর্ভের অভ্যন্তরে যে স্থানে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়, সেই স্থানকে ভূমিকম্পের কেন্দ্র (focus or hypocentre) বলে। ভূমিকম্পের কেন্দ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে ভূ-অভ্যন্তরে 50 কিমি-র মধ্যে অবস্থান করে। তবে অধিকাংশ ভূমিকম্পের কেন্দ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে 16 কিমি-র মধ্যে থাকে। আবার, 700 কিমি গভীরেও ভূমিকম্প কেন্দ্রের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে তরঙ্গের আকারে কম্পন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই কেন্দ্র কোনো জ্যামিতিক কেন্দ্র বা বিন্দু নয়। ভূকম্পের কেন্দ্রকে অনেকে ফোকাস (Focus)-ও বলে। ভূমিকম্পের কেন্দ্র হল ভূগাঠনিক স্থান(tectonic location)। এটি ভূ-অভ্যন্তরে অবস্থিত হওয়ার দরুন এখানে ক্ষয়ক্ষতি কম হয়। ভূমিকম্পের কেন্দ্রের গভীরতা অনুসারে ভূমিকম্পের কেন্দ্রকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

চিত্র-ভূমিকম্পের কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র

(i) অগভীর ভূমিকম্প কেন্দ্র(Shallow foci Earthquake): অগভীর ভূমিকম্পের কেন্দ্র সাধারণত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ভূ-অভ্যন্তরে 60 কিমি গভীরতার মধ্যে অবস্থান করে। এই অগভীর কেন্দ্রে পৃথিবীর অধিকাংশ ভূমিকম্প কেন্দ্রের অবস্থান লক্ষ্য করা গেছে।

(ii) মধ্যম গভীর ভূমিকম্প কেন্দ্র (Intermediate Foci Earthquake): অগভীর ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে ভূ-অভ্যন্তরে প্রায় 300 কিমি গভীরতাযুক্ত স্থানের মধ্যে মধ্যম গভীর ভূমিকম্পের কেন্দ্র অবস্থিত। এই কেন্দ্রের মধ্যে খুব কম ভূমিকম্পের কেন্দ্র লক্ষ্য করা গেছে।

(iii) গভীর ভূমিকম্প কেন্দ্র (Deep foci Earthquake): গভীর ভূমিকম্পের কেন্দ্রের গভীরতা ভূ-অভ্যন্তরের 300 কিমি থেকে প্রায় 700 কিমি-এর মধ্যে অবস্থান করছে। এই কেন্দ্রে খুবই কম ভূমিকম্পের কেন্দ্র লক্ষ করা যায়।

◆ **ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র (Earthquake Epicentre):** ভূ-অভ্যন্তরে সৃষ্ট ভূমিকম্প কেন্দ্র বা ফোকাসের ঠিক সোজাসুজি উপরে অর্থাৎ উল্লম্বদিকে সবচেয়ে কাছের ভূপৃষ্ঠ অবস্থিত স্থান বা বিন্দুকে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র বলে। অর্থাৎ, কম্পনের কেন্দ্র থেকে লম্বভাবে ভূপৃষ্ঠের উপর অবস্থিত স্থানকে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র (Epicentre of the Earthquake)। সুতরাং কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রের মধ্যে উল্লম্ব দূরত্ব লক্ষ্য করা যায়। সেই কারণে এটি হল ক্ষুদ্রতম দূরত্ব। ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রে কম্পনের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয় এবং উপকেন্দ্র থেকে দূরবর্তী স্থানে ভূমিকম্পের তীব্রতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু, উপকেন্দ্রের নিকটবর্তী স্থানে ভূপৃষ্ঠের বেশি পরিবর্তন হয়। ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র থেকে তরঙ্গগুলি অনুভূমিকভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি লক্ষ করা যায়।

◆ **প্রতিপাদ উপকেন্দ্রঃ-**ভূগোলকের উপরে উপকেন্দ্রের ঠিক বিপরীতে অবস্থিত স্থানটিকে ভূমিকম্পের প্রতিপাদ উপকেন্দ্র বলে। অর্থাৎ, ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে কম্পনের তরঙ্গ সর্বাধিক যে দূরবর্তী স্থানে পৌঁছায় ভূপৃষ্ঠের সেই স্থানটিকে ভূমিকম্পের প্রতিপাদ উপকেন্দ্র বলে।

C. ভূকম্পন তরঙ্গ (Seismic Wave):-

ভূমিকম্পের সময় যে শক্তি নির্গত হয় তা পাথরের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করে। এই সময় যে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, তাকে ভূকম্পন তরঙ্গ বলে। এই তরঙ্গ পৃথিবীর অভ্যন্তরের বস্তুসমূহের মধ্য দিয়ে যেতে পারে এবং যে-কোনো স্থানে সিসমোগ্রাফ নামক যন্ত্রের সাহায্যে তা ধরাও যায়।

◆ **ভূকম্পীয় তরঙ্গের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Seismic Waves):-**

ভূকম্পীয় তরঙ্গকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- **(i) দেহ তরঙ্গ এবং (ii) পৃষ্ঠ তরঙ্গ।**

(i) দেহ তরঙ্গ (Body Wave):- যে সব তরঙ্গ ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে উৎপন্ন হয়ে ভূ-অভ্যন্তরের মধ্যদিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভূপৃষ্ঠে পৌঁছায় তাদের দেহ তরঙ্গ বলে। দেহ তরঙ্গকে ভূ-অভ্যন্তরস্থ তরঙ্গও বলা হয়। এই তরঙ্গের সাহায্যে ভূ-অভ্যন্তরের গঠন, স্তর-বিন্যাস এবং পদার্থের প্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে জানা যায়। দেহ তরঙ্গ আবার দু-প্রকারের। যেমন- প্রাথমিক তরঙ্গ বা P তরঙ্গ এবং গৌণ তরঙ্গ বা S তরঙ্গ।

(a) প্রাথমিক তরঙ্গ (Primary Wave):- যে সব তরঙ্গ ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে উৎপন্ন হয়ে ভূ-অভ্যন্তরের সমস্ত মাধ্যমের মধ্যদিয়ে সর্বাধিক দ্রুত গতিতে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রে পৌঁছায়, তাদের প্রাথমিক তরঙ্গ বা P তরঙ্গ বলে।

◆ ***বৈশিষ্ট্য (Characteristic):-***

(1) P তরঙ্গ হল অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ।

(2) এই তরঙ্গ যেদিকে প্রবাহিত হয়, মাধ্যমের কণাগুলি সেদিকেই কাঁপতে থাকে এবং এর গতিবেগ সবচেয়ে বেশি।
(3) এটি কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় সকল বস্তুকণার মধ্য দিয়ে যেতে সক্ষম।
(4) এটি সরাসরি পৃথিবীর কেন্দ্রমন্ডলের মধ্য দিয়ে অপর প্রান্তে চলে যেতে পারে।
(5) ভূত্বকে এর গতিবেগ প্রতি সেকেন্ড 4.28 - 6.5 কিমি, গুরুমন্ডলে 6.47 - 13.4 কিমি এবং কেন্দ্রমন্ডল 8.0 - 11.3 কিমি।

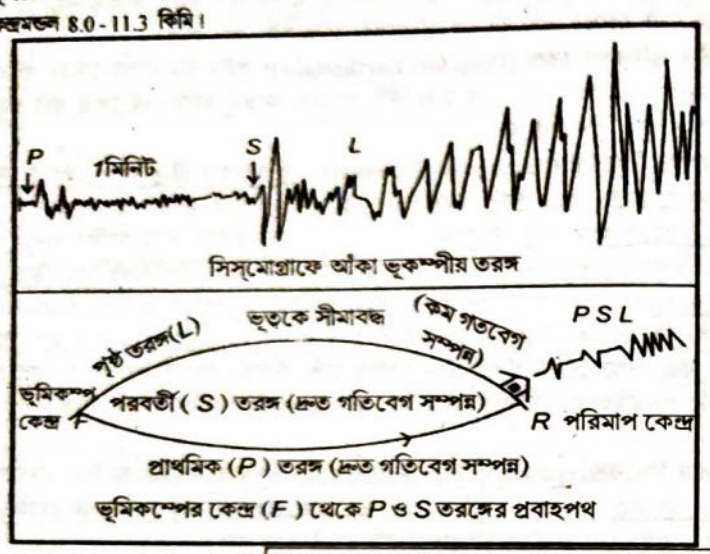

(b) গৌণ তরঙ্গ বা S তরঙ্গ (Secondary Wave):-

দ্বিতীয় পর্যায়ের তরঙ্গ হচ্ছে কৃন্তন বা মোচড় তরঙ্গ, যা ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র থেকে আড়াআড়িভাবে (aransverse) অগ্রসর হয়। এটি ভূকম্পলেখ যন্ত্রের তরঙ্গের পরে এসে পৌঁছয় বলে, একে দ্বিতীয় পর্যায়ের তরঙ্গ বলা হয়। গতি-বেগ প্রাথমিক তরঙ্গ অপেক্ষা কম, তরঙ্গ মাধ্যমে চলতে পারে না, ভূপৃষ্ঠকে উপরে-নীচে আন্দোলিত করে বা ঝাঁকুনি দেয় বলে একে ঝাঁকুনি তরঙ্গও (shake wave) বলা হয়। এ তরঙ্গ সঞ্চার মাধ্যমে আকৃতিগত পরিবর্তন (পীড়ন) ঘটিয়ে

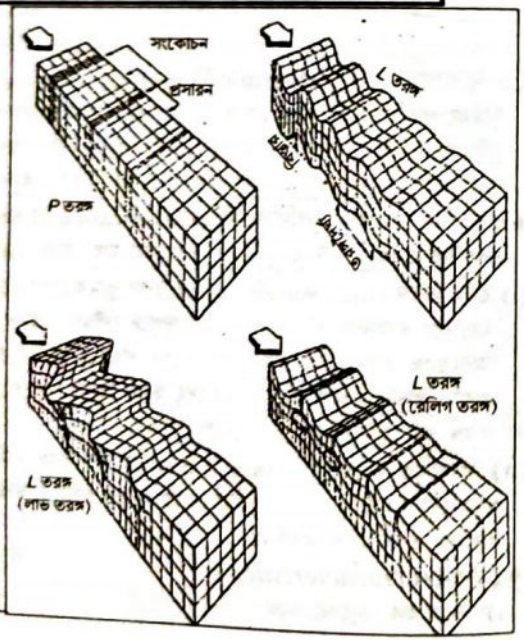

সঞ্চারিত হয়। যেহেতু শুধুমাত্র কঠিন পদার্থেরই নির্দিষ্ট আকৃতি সম্ভব, সেজন্য এ তরঙ্গ কঠিন ভূগর্ভ ছাড়া অন্য কোথাও সঞ্চারিত হয় না। 2900 কিমি গভীরতায় এ তরঙ্গ হঠাৎ বিলুপ্ত হয় বলে অনুমান করা হয় 2,900 কিমি-এর ঠিক নিচে ভূগর্ভে বস্তু গলিত অবস্থায় আছে। সঞ্চার মাধ্যমের পীড়ন দ্বারা এ তরঙ্গ সঞ্চারিত হয় বলে, এ তরঙ্গকে অনেকে পীড়ান তরঙ্গ (shear wave) বলে থাকেন। প্রাথমিক তরঙ্গের চেয়ে S তরঙ্গের গতিবেগ কম।

(ii) পৃষ্ঠ তরঙ্গ বা দীর্ঘ তরঙ্গ বা পার্শ্ব তরঙ্গ (Surface Wave or L-wave):- পৃষ্ঠ তরঙ্গ ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে সোজা উপরে উপকেন্দ্রে পৌঁছায় এবং সেখান থেকে ভূত্বকের উপরের অংশ দিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলো দেহ তরঙ্গ অপেক্ষা কম গতিবেগ সম্পন্ন। নিম্ন কম্পাঙ্ক, দীর্ঘ স্থিতি কাল, বিশাল বিস্তার (amplitude) ইত্যাদি কারণে এগুলো খুবই ধ্বংসাত্মক ভূকম্প তরঙ্গ। এই তরঙ্গের গতিবেগ P বা S তরঙ্গ অপেক্ষা কম এবং এ তরঙ্গের গতির সাহায্যেই ভূমিকম্পের কেন্দ্র নির্ণয় করা হয়। ভূকম্পলেখ যন্ত্রে পৃষ্ঠতরঙ্গের উপস্থিতির সময়কালের ওপর ভিত্তি করে ভূমিকম্পের কেন্দ্র নির্ণয় করা হয়। পৃষ্ঠ তরঙ্গ দুই ধরনের। যথা- লাভ তরঙ্গ (love waves) ও রেলিগ তরঙ্গ (rayleigh waves)।

(a) লাভ তরঙ্গ (Love Waves):- ভূমিকম্পের পৃষ্ঠ তরঙ্গ স্থিতিস্থাপক ভূপৃষ্ঠকে ছাপিয়ে একপাশে সংকুচিত করে পর মুহূর্তে আবার বিপরীত পাশে চাপ সৃষ্টি করে সংকুচিত করে, তখন বিপরীত পীড়নের সৃষ্টি হয়। যে পাশে সংকোচন ঘটে তার বিপরীত পাশে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এভাবে পৃষ্ঠ তরঙ্গ ভূপৃষ্ঠে যে অনুভূমিক বিপরীত পীড়নের সৃষ্টি করে, তাকে লাভ তরঙ্গ বলে। 1911সালে এ.ই. এইচ.লাভ(A. E. H. Love) গাণিতিকভাবে এ তরঙ্গের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বলে, তার নামানুসারে এ তরঙ্গকে লাভ তরঙ্গ বলে। লাভ তরঙ্গ ভূপৃষ্ঠকে অনুভূমিক ভাবে স্থানচ্যুত করে থাকে।

(b) রেলিগ তরঙ্গ (Rayleigh Waves):- রেলিগ তরঙ্গ এক ধরনের পৃষ্ঠ তরঙ্গ, একে ভূমি গড়ানো তরঙ্গও বলা হয়। রেলিগতরঙ্গ উল্লম্বভাবে পশ্চাদমুখী উপবৃত্তকার গতিতে অগ্রসর হয়। এ তরঙ্গের গতিবেগ লাভ তরঙ্গ অপেক্ষা কম। এটি জল পৃষ্ঠের উপরের তরঙ্গের মতো মৃদু তরঙ্গ তুলে অগ্রসর হয়। 1885 সালে লর্ড রেলিগ এ তরঙ্গের অস্তিত্বের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। রেলিগ ও লাভ উভয় প্রকার তরঙ্গের ফলে ভূপৃষ্ঠের পদার্থসমূহ নিম্নগামী হয়।

D. ভূকম্পন তীব্রতা (Intensity of Earthquake /Seismic Intensity):-

ভূকম্পের সময় ভূমির ত্বরণের মাত্রাকে ভূকম্পন তীব্রতা বলে। ইতালির ভূতত্ত্ববিদ জি. মাকালি (Giuseppe Mercalli) 1905 সালে ভূমিকম্পের তীব্রতা পরিমাপের জন্য একটি মাত্রাক্রম(Scale) প্রবর্তন করেন। এটি মার্কালি তীব্রতা স্কেল (মাত্রাক্রম) নামে পরিচিত। পরবর্তীতে1931 সালে তিনি এটির পরিমার্জিত রূপ প্রকাশ করেন। মার্কালির পরিমার্জিত স্কেলে I থেকে 12 টি পর্যন্ত সংখ্যা দ্বারা ভূমিকম্পের মাত্রা প্রকাশ করা হয়।

■ ভূমিকম্পের তীব্রতা পরিমাপের পরিমার্জিত মার্কালি স্কেল-

1. ধর্তব্য নয় (Negligible)	কেবলমাত্র যন্ত্রে ধরা পড়ে।
2. দুর্বল (Feeble)	সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা বুঝতে পারে। ঝোলানো বস্তু দোলে।
3. ক্ষীণ (Slight)	রেল লাইনের স্লিপারের পার্থক্য ঘটে। দাঁড়ানো মোটর গাড়ি দুলে ওঠে।
4. মাঝারি (Moderate)	ঘরের ভিতরে ঝাঁকুনি অনুভব করা যায়। কোনো কোনো ঘুমন্ত মানুষ জেগে উঠতে পারে। ঝোলানো বস্তু দুলতে থাকে। ভারী গাড়ি দালানে আঘাত করেছে বলে অনুভব হয়। জানালা ও বাসন-কোশন ঝনঝন শব্দ করে। দাঁড়ানো গাড়ি দোলে।
5. কিছুটা শক্তিশালী (Rather strong)	অধিকাংশ মানুষ বুঝতে পারে ; অনেকে জেগে ওঠে। দেয়ালের আস্তরণ খসে পড়ে। বাসনপত্র ও জানালা ভেঙ্গে যায়। দেয়াল ঘড়ির দোলক থেমে যায়।
6. শক্তিশালী (Strong)	সকলেই বুঝতে পারে, অনেকে ভয় পেয়ে যায়। চিমনি পড়ে যায়। আসবাবপত্র নড়ে।
7. খুব শক্তিশালী (Very Strong)	বিপদ সংকেত ; অধিকাংশ মানুষ বাইরে ছুটে যায়। দুর্বল স্থাপত্যগুলো আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মোটরগাড়ি গড়াতে শুরু করে।
8. ধ্বংসাত্মক (Destructive)	সাধারণ সতর্কসংকেত ; সকলেই বাইরে ছুটতে থাকে। দুর্বল স্থাপত্যগুলো প্রায় ধ্বংস হয়ে যায় ; শক্তিশালী কাঠামোগুলো আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ভারী আসবাবপত্র উল্টে পড়ে।
9. ধ্বংসকর (Ruinous)	নিয়ন্ত্রণহীন আতঙ্ক। দুর্বল স্থাপনা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। বিশেষভাবে নক্সাকৃত কাঠামোর সামান্য ক্ষতি হয়। ভিত্তি দুর্বল হয়। ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইন ফেটে যায়। ভূপৃষ্ঠে ফাটল সৃষ্টি হয়।
10. বিপর্যয়কর (Disastrous)	নিয়ন্ত্রণহীন আতঙ্ক। কেবলমাত্র ভালো দালানগুলো টিকে থাকে। ভিত্তি ধ্বংস হয়। রেল লাইন বেঁকে যায়। ভূমি মারাত্মকভাবে ফেটে যায়।
11. মহাবিপর্যয়কর (Very disastrous)	নিয়ন্ত্রণহীন আতঙ্ক। পাথরের নির্মিত কতিপয় অবকাঠামো দাঁড়িয়ে থাকে। ভূপৃষ্ঠে বিস্তীর্ণ ফাটলের সৃষ্টি হয়। বড় ধরনের ভূমিধ্বস হয়।
12. বিপর্যয় (Catastrophic)	নিয়ন্ত্রণহীন মহাআতঙ্ক। সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়। ভূমিতে তরঙ্গ দেখা যায় সবকিছু শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়।

E. ভূকম্পন মাত্রা (Earthquake Magnitude):-

ভূকম্পের সময় কতটা শক্তি নির্গত হয় তা হিসাব করে বের করা যায়। এ শক্তির পরিমাণকে ভূকম্প মাত্রা বলে। তরঙ্গবিস্তারের পরিমাণ থেকে এটি বের করা হয়। পৃষ্ঠতরঙ্গ এবং ভূগর্ভস্থ তরঙ্গের ভূ-কম্পমান নির্ধারণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সমীকরণ ব্যবহৃত হয়। 1935সালে আমেরিকানভূ কম্পবিদ চার্লস রিখটার (Charles Richter) ভূকম্পন মাত্রার যে ক্রম প্রস্তাব করেন তা রিখটার স্কেল

নামে পরিচিত। রিখটার মাত্রাক্রম সাধারণত ভূকম্পনের মাত্রা বোঝাতে আজকাল ব্যবহৃত হয়।

এ স্কেল লগারিদমীয়, অর্থাৎ প্রতিটি মাত্রা-সংখ্যা তার পূর্ববর্তী মাত্রা-সংখ্যার শক্তির দশগুণ শক্তির সূচক। 0 থেকে 10 পর্যন্ত 10 টি মাত্রাসূচক এই স্কেলে আছে। 4.5 মাত্রার বেশি হলেই সে ভূকম্পে ভূ-পৃষ্ঠে স্থায়ী পরিবর্তন ও ক্ষতি ঘটে থাকে। সাধারণত প্রলয়ংকর ভূকম্পগুলোর কম্পনমাত্রা 7-এর বেশি হয়ে থাকে। ভূকম্পের সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমির ত্বরণের মাত্রা (g = অভিকর্ষজনিত ত্বরণ) যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা হয় এবং অভিকর্ষজাত ত্বরণের দশমাংশ রূপে প্রকাশ করা হয়। আজ পর্যন্ত যেসব ভূকম্প নিরীক্ষণ করা গেছে, তাতে সর্বাধিক মাত্রা ছিল 8.9। একটি বিশেষ ধরনের সিসমোমিটারে শূন্য থেকে অনুভূমিক বিস্তারের সর্বৃহৎ বিচ্যুতি লগারিদম স্কেলে 10 গুণ হিসাবে করা হয়। যেমন-রিখটার স্কেলে একটি ভূমিকম্পের মাত্রা 5.0এর অর্থ হলো এটি 4.0 মাত্রার ভূমিকম্পের ঝাঁকুনির অনুভূমিক বিস্তৃতি অপেক্ষা 10 গুণ বেশি বিস্তৃত।

F. ভূকম্পন পরিলেখ (Seismogram):-

ভূকম্প তরঙ্গ রেকর্ড করার যন্ত্রে গ্রাফরূপে যে ভূকম্প তরঙ্গ ধরা পড়ে তাকে ভূকম্প পরিলেখ বলে। যেকোনো ভূকম্প পরিলেখতে তিন গুচ্ছ তরঙ্গ দেখা যায়। যে গুচ্ছটি সর্বপ্রথম ধরা পড়ে তা সর্বাধিক দ্রুতগতির P তরঙ্গ, তার পরেরটি S তরঙ্গ এবং সর্বশেষটি অপেক্ষাকৃত শ্লথগতির L তরঙ্গ।

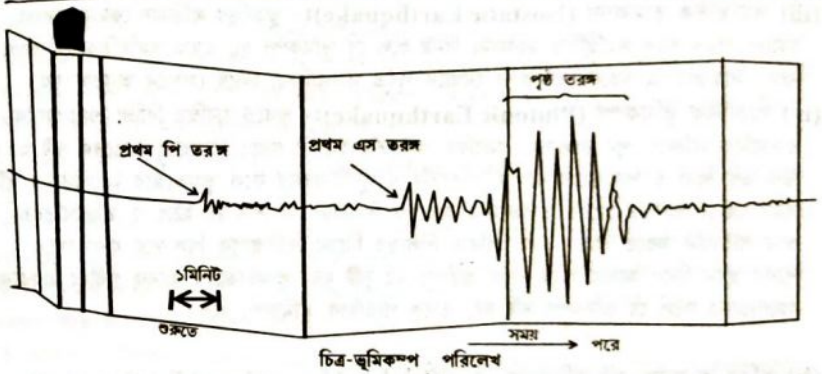

চিত্র-ভূমিকম্প পরিলেখ

G. ভূমিকম্পের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Earthquake):-

ভূমিকম্পের শ্রেণীবিভাগ
(Classification of Earthquake)

- উৎপত্তির ভিত্তিতে (On the basis of Origin)
  - (i) প্রাকৃতিক ভূমিকম্প
    - (i) আগ্নেয় ভূমিকম্প
    - (ii) ভূগাঠনিক ভূমিকম্প
    - (iii) সমস্থিতিক ভূমিকম্প
    - (iv) পাতালিক ভূমিকম্প
  - (ii) কৃত্রিম বা মনুষ্য সৃষ্ট ভূমিকম্প
- উৎসস্থলের ভিত্তিতে (On the basis of Focus)
  - (i) অগভীর ভূমিকম্প
  - (ii) মধ্যবর্তী ভূমিকম্প
  - (iii) গভীর ভূমিকম্প
- মানুষের প্রাণহানির ভিত্তিতে (On the basis of Human casualities)
  - (i) মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ ভূমিকম্প
  - (ii) উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ
  - (iii) ভয়ানক ঝুঁকিপূর্ণ ভূমিকম্প

সপ্তম অধ্যায়

ভূমিকম্প
(Earthquake)

চোখে দেখা যায় না এমন কোনো কারণে ভূপৃষ্ঠের কোনো অংশ অতি অল্প সময়ের মধ্যে হঠাৎ মৃদু অথবা খুব জোরে কেঁপে ওঠে* তখন তাকে ভূমিকম্প (Earthquake) বলে। ঝাঁকুনি বা কম্পন খুব আস্তে হলে অনেক সময় তা বোঝা যায় না, কিন্তু ঝাঁকুনি যদি খুব জোরে ও অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়, তবে ভূপৃষ্ঠে ধ্বংসস্তূপের সৃষ্টি হয়।

ভূমিকম্প সমান মাত্রায় সব জায়গায় হয় না। কোথাও তীব্র কোথাও মৃদু। এই কম্পন মাপা হয় ভূকম্পলিখ (Seismograph) যন্ত্রের সাহায্যে। ভূবিজ্ঞানী মার্সেলি ভূকম্পনের তীব্রতা মাপার স্কেল আবিষ্কার করেছিলেন। এই স্কেল অনুসারে তীব্রতা 1 থেকে 12 পর্যন্ত ধরা হয়।

অপর এক বিজ্ঞানী রিক্টরও ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপার একটি স্কেল নির্ণয় করেছিলেন। এই স্কেল অনুসারে 1 থেকে 10 পর্যন্ত তীব্রতা মাপা হয়। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ভূমিকম্প হয়েছে রিক্টর স্কেল অনুসারে তাদের তীব্রতার মান গড়ে 8.6। গবেষণা থেকে জানা গেছে যে, কম্পনের কেন্দ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 16 কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থান করে।

ভূমিকম্পের কারণ :

নানা কারণে ভূপৃষ্ঠ কেঁপে ওঠে, যেমন—

1) ভূবিজ্ঞানীদের মতে ভূত্বক কতগুলি চলমান 'প্লেট' (plate) বা পাতের সমন্বয়ে তৈরি। চলমান পাতগুলির মধ্যে যখন দুটো পাত পরস্পরের মুখোমুখি হয় তখন ওই সংযোগরেখা বরাবর শিলাচ্যুতি ঘটে। এর ফলে মাটি কেঁপে ওঠে। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, পৃথিবীর ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলগুলি পাতসীমা বরাবর অবস্থিত।

---

* কোনো বড়ো গাড়ি রাস্তা দিয়ে গেলে কিংবা কোনো উঁচু নীচু জায়গায় পড়ে ঝাঁকুনি খেলে তাতেও চারপাশের মাটি কেঁপে উঠতে পারে। কিন্তু এই কেঁপে ওঠা ভূমিকম্প নয়, কারণ ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে কম্পন ভূত্বকের শিলাস্তর অবলম্বন করে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত যাবে এবং তা সিস্‌মোগ্রাফে অনুভূত হবে। কিন্তু গাড়ি যাওয়ার ফলে যে-কম্পন তা ভূপৃষ্ঠের শুধুমাত্র মাটির স্তরে অনুভূত হয় এবং অল্প একটু দূরে গিয়েই তা মিলিয়ে যায়।

2) আবার চলমান পাতগুলি পরস্পরের থেকে দূরে সরে গেলে ভূগর্ভে চাপের হেরফের হয়, যা ভূমিকম্পের একটি কারণ।

3) নবীন ভঙ্গিল পার্বত্য অঞ্চলের গঠনকার্য এখনও চলছে (যেমন - হিমালয়)। ওই অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠে এখনও স্থিতিস্থাপকতা (stability) আসেনি। ফলে কোমল পাললিক শিলায় ভাঁজ পড়ার সময় মাটি কেঁপে ওঠে। এই কারণে হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে মাঝে মাঝে ভূমিকম্প হয়।

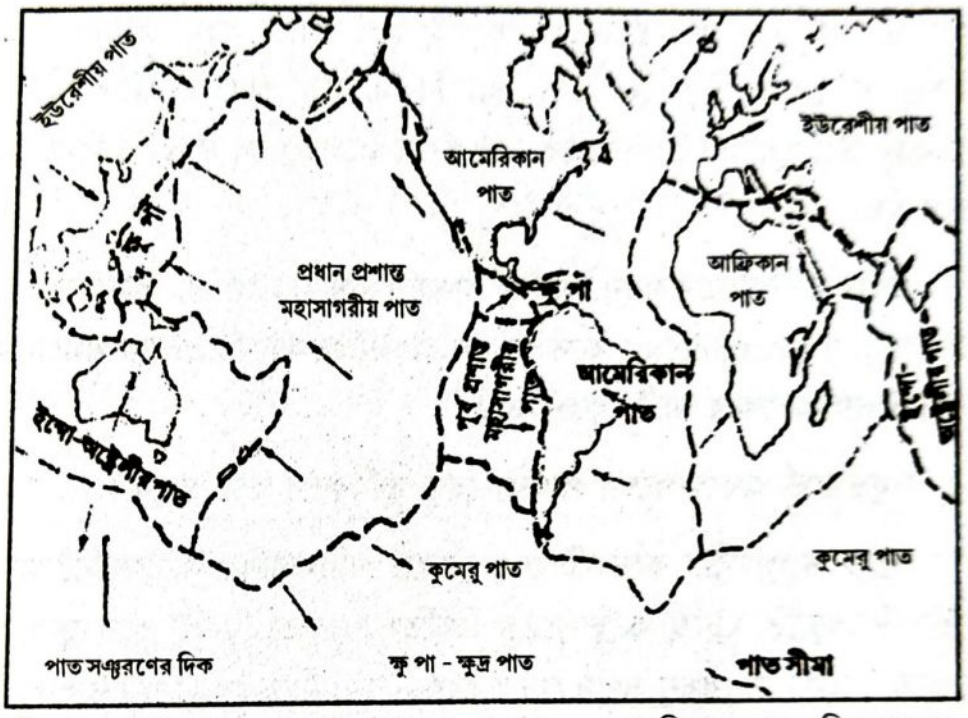

চিত্র 21 ঃ প্লেটের অবস্থান। দুটো পাত যখন পরস্পরের মুখোমুখি হয়, তখন ভূমিকম্প হয়।

4) ভূগর্ভে কোনো কারণে শিলাচ্যুতি ঘটলে বা ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থান চ্যুতির ফলে সরে গেলে (displacement) ভূগর্ভে চাপের স্থিতিস্থাপকতা আর থাকে না। তখন চ্যুতি তল বরাবর চাপের মোচন হয় বলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

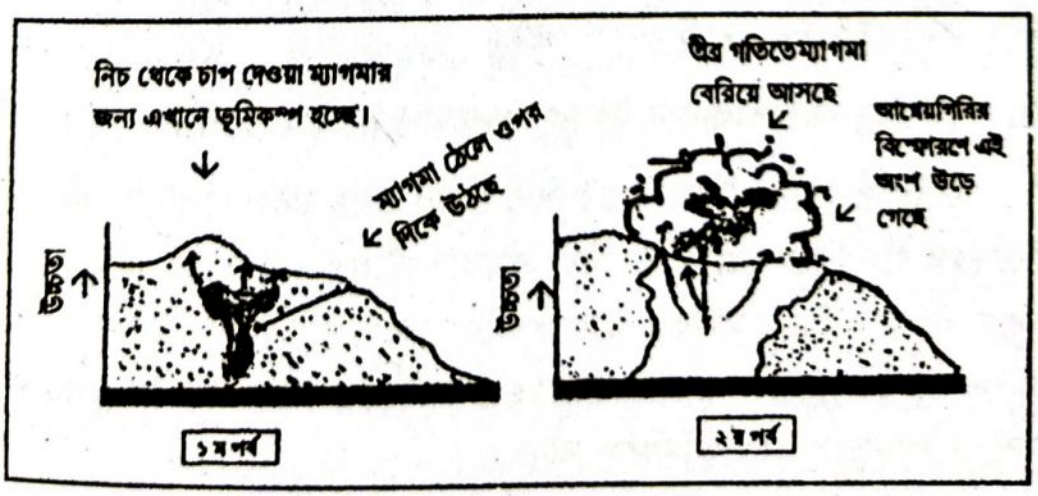

চিত্র 22 ঃ অগ্ন্যুৎপাতের জন্য অনেক সময় ভূমিকম্প হয়।

5) আগ্নেয়গিরি থেকে প্রবলবেগে অগ্ন্যুৎপাতের সময় আশেপাশের ব্যাপক এলাকা কেঁপে ওঠে ও প্রবল ভূমিকম্প হয়, যেমনটি ঘটেছিল ক্রাকাতাও আগ্নেয় দ্বীপে।

1883 সালে মে মাসে ওই দ্বীপে পার্বোওয়াতান জ্বালামুখ সক্রিয় হয়ে ওঠে আর তার সঙ্গে সঙ্গে পাশের জ্বালামুখ দানামও সক্রিয় হয়ে ওঠে। এর ফলে মে মাস থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত 2 বার অগ্ন্যুদ্গম ঘটে। এর মধ্যে 26 আগস্ট প্রায় প্রত্যেক 10 মিনিট অন্তর উদ্গিরণ ঘটতে থাকে আর বিরাট ক্রাকাতাও দ্বীপ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং সেখানে সমুদ্রের সৃষ্টি হয়। এই বিস্ফোরণের শব্দ এত তীব্র হয়েছিল যে ওই দ্বীপ থেকে প্রায় 5000 কি.মি. দূরের অস্ট্রেলিয়াতেও তা শোনা গিয়েছিল এবং 80 কি.মি. উঁচু আগ্নেয় মেঘ সৃষ্টি হয়। এই বিস্ফোরণে 36মি. উঁচু সুনামির উৎপত্তি হয়, যার প্রবল জলোচ্ছ্বাসে জাভা ও সুমাত্রার 36,000 মানুষ জলমগ্ন হয়।

6) প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুন পার্বত্য অঞ্চলে ধস নামলে বা হিমবাহের কিছু অংশ হিমানী সম্প্রপাতরূপে (avalanche) খসে পড়লে বা খনিজ পদার্থ তোলার সময়ে খনিতে ধস নামলে আশেপাশের এলাকার মাটি কেঁপে ওঠে।

7) সমুদ্রগর্ভে অবক্ষেপণের পার্থক্য হেতু ভূমিকম্প হয়ে থাকে।

8) বর্তমানে পৃথিবীর কয়েকটি দেশ ভূগর্ভে পারমাণবিক পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছে। ফলে ভূগর্ভের শিলাচ্যুতি ঘটছে ও ভূপৃষ্ঠের স্থিতিস্থাপকতা বিনষ্ট হয়ে ভূকম্পের সৃষ্টি করছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যখন ভূপৃষ্ঠ থেকে বেশ কিছুটা নীচে বোমা ফাটিয়ে তার (বোমার) শক্তি পরীক্ষা করা হয়, তখনও ব্যাপক এলাকা জুড়ে ভূমিকম্প হতে পারে। এ ছাড়া পাহাড়ে রাস্তা তৈরির জন্য ডিনামাইট চার্জ করা হলে আশেপাশের এলাকায় ভূমিকম্প হতে পারে। এ ধরনের ভূমিকম্পে ধসের সম্ভাবনা থাকে।

9) কখনো-কখনো ক্ষুব্ধমণ্ডল থেকে তাপপ্রবাহ পরিচলন আকারে ওপরে উঠে এসে ভূপৃষ্ঠে ধাক্কা দেয়। সেই সময় মাটি কেঁপে ওঠে।

10) ধূমকেতু বা বিশালাকার উল্কার সংঘাতে ভূকম্প হতে পারে।

11) জলাধার তৈরির ফলে নীচের শিলাস্তরের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়। এর ফলে ওপরের শিলাস্তর বসে গিয়ে ভূমিকম্প ঘটায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রকৃতিকে নিজের কাজে লাগাতে গিয়ে মানুষও পরোক্ষভাবে ভূমিকম্প ঘটাচ্ছে। যেমন 1967 সালে মহারাষ্ট্রের কয়নার ভূমিকম্প। কয়না জলাধারের জলরাশি নীচের শিলাস্তরের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করলে তা স্থানচ্যুত হয়ে ভূমিকম্প ঘটায়।

ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল :

পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলিতে হয়।

1) হিমালয়, আল্পস, রকি, অ্যান্ডিজ ইত্যাদি নবীন ভঙ্গিল পর্বতগুলির গঠন কার্য এখনও চলছে। ফলে এইসব স্থানে বেশি ভূমিকম্প হয়।

2) **খাড়া উপকূলভাগ** (Steep Coast) : জাপান, ইন্দোনেশিয়া, নিউজিল্যান্ডের খাড়া উপকূলভাগের ভূমি সুস্থিত নয়, ফলে এখানে মাঝে মাঝে ভূমিকম্প হয়।

3) **আগ্নেয়গিরি অঞ্চল** (Volcanic Region) : যেসব স্থানে আগ্নেয়গিরি আছে সেখানে অগ্ন্যুৎপাতের সময় ভূমিকম্প হয়। পৃথিবীতে দুটি ভূমিকম্প বলয় আছে।

(i) একটি প্রশান্ত মহাসাগরকে বেষ্টন করে অবস্থান করছে।

(ii) অপরটি ভূমধ্যসাগরের অভ্যন্তরভাগ দিয়ে পূর্ব-পশ্চিম উভয়দিকে প্রসারিত হয়েছে। প্রথমটির নাম 'প্রশান্ত মহাসাগরীয় আগ্নেয় মেখলা বলয়' (Fiery Ring of the Pacific) এবং দ্বিতীয়টির নাম 'ভূমধ্য-পার্বত্য ভূমিকম্প বলয়' (Mid-World Mountain Belt)।

গুজরাটের ভূজ ভূমিকম্প

2001 সালের **26** জানুয়ারি ভারতের গুজরাট রাজ্যের ভূজ-এ রাত **3** টে **16** মিনিট জি.এম. টি. সময়ে **7.6** রিখটার মাত্রা এক ভূমিকম্প হয়। এই ভূমিকম্পের একমাস পরে ভারত সরকারের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, এই ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ছিল **19,727** এবং আহতের সংখ্যা **1,66,000**। এ ছাড়া **6,00,000** লোক গৃহহীন হয়ে পড়ে **3,48,000** বাড়ি ধ্বংস হয় এবং মোট **37.8** মিলিয়ন লোকের মধ্যে **15.9** মিলিয়ন লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভূজ ভূমিকম্পে **20** হাজারেরও বেশি গবাদি পশু মরা যায় এবং সরকারি হিসেব অনুযায়ী মোট **1.3** বিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়। **1819** সালে ভয়াবহ গুজরাট ভূমিকম্পে যেসব ঐতিহাসিক স্থাপত্য ভূমিকম্পের প্রকোপ থেকে বেঁচে যায় **2001** সালের ভূমিকম্পে তাদের কয়েকটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এক সমীক্ষায় জানা যায় :— ওই অঞ্চলের ভূমিতে কতকগুলি আঁ-এশেলোঁজাতীয় ফাটল দেখা গেছে, কিন্তু কোনো চ্যুতি ভৃগুতট সৃষ্টি হয়নি। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভূপৃষ্ঠের নীচে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত 2 কিলোমিটার লম্বা একটি চ্যুতির কারণেই ভূপৃষ্ঠে ফাটল দেখা যায়। 4 ফেব্রুয়ারি **2001** কয়েকজন উদকবিজ্ঞানী লক্ষ করেন, কয়েকশো বছর ধরে শুষ্ক থাকা কয়েকটি নদীতে প্রবাহ শুরু হয়েছে। এই অবস্থা লিকুইফ্যাকশনের **(Liquefaction)** কারণে হয়েছে বলে মনে করা হয়। *(পার্থ বসু, 2008, প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ভূমিরূপ বিদ্যা)*

বিশেষত তা আগ্নেয় বা পরিবর্তিত শিলা দ্বারা তৈরি করা হলে বাড়িগুলি শক্তপোক্ত হয় ও তা ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা কমে যায়। GPS পদ্ধতির মাধ্যমে অতি সহজেই ভূ-স্তরের পরিবর্তনের অধ্যয়ন এবং পাতগুলির ক্রমচলনের ফলে তার উপরিস্থিত ভূ-স্তরের উপরিভাগের পরিবর্তনের প্রকৃতি অধ্যায়ন করা যায় এবং ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে সেখানকার মানুষদের সতর্ক করে দেওয়া যায়।

3. ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা (Rehabilitation Measures):-

ভূমিকম্প ঘটে যাওয়ার পর ওই অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হয়। দক্ষ বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, NGO এবং সমাজসেবী সংস্থা এই পুনর্বাসনের কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে। এই কার্যক্রমের মধ্যে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের খাদ্য, পানীয়, আশ্রয়, ওষুধ প্রভৃতির ব্যবস্থা। এছাড়া এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে যা করণীয় তা হল-

(i) ভূমিকম্প প্রবণ এলাকাগুলির ম্যাপ প্রস্তুত করে সেখানকার মানুষদের ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(ii) ভূমিকম্প প্রবণ এলাকার মানুষদের ঘরবাড়ি তৈরি করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানানো এবং বাড়ি নির্মাণের উপযোগী উপকরণের যোগান দেওয়া।

(iii) ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে আগে থেকেই রিলিফের ব্যবস্থা করা।

● **ভূমিকম্পের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ব্যক্তিস্তরে করণীয় দিক সমূহ-**

(i) ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায় বাড়িঘর তৈরি করার সময় কোনো সরকারী দপ্তর বা ইঞ্জিনিয়ারের কাছে জানতে হবে যে কোন্ কোন্ উপকরণের দ্বারা বাড়ি করতে হবে।

(ii) বাড়িটি যাতে সহজে ভেঙ্গে না পড়ে তার জন্য উপযুক্ত বস্তু দিয়ে বাড়ির বেসমেন্ট তৈরি করতে হবে।

(iii) ভূমিকম্প হওয়ার পূর্বে বাড়ির বিভিন্ন জিনিস সঠিকভাবে রাখতে হবে। যেমন ভারী বস্তুগুলিকে ঝুলিয়ে না রেখে আলমারির নিচের তাকে রাখতে হবে। কাঁচের জিনিসগুলোকে আলমারিতে বন্ধ করে রাখতে হবে।

(iv) বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা খুব সঠিকভাবে হওয়া দরকার।

(v) ভূমিকম্পের সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোনো ফাঁকা স্থানে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তা সম্ভব না হলে কোনো শক্ত টেবিলের নিচে আশ্রয় গ্রহণ করে মাথায় বালিশ চাপা দিয়ে রাখতে হবে।

M. সুনামি (Tsunami):-

সুনামি একটি জাপানি শব্দ। এর শাব্দিকর অর্থ tsu = পোতাশ্রয় + nami = তরঙ্গ। অর্থাৎ সুনামির শাব্দিক অর্থ পোতাশ্রয় তরঙ্গ। ভূকম্প বা ভূগাঠনিক করণে সৃষ্ট তীব্র গতিসম্পন্ন ও ধ্বংসাত্মক সাগর তরঙ্গকে বোঝানোর জন্য সুনামি শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র থেকে এক বা একাধিক সুনামি তরঙ্গ সৃষ্টি হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সাগরের সাধারণ ঢেউ-এর সাথে সুনামির পার্থক্য হচ্ছে, সুনামির ঢেউ ভেঙে যায় না, ঢেউ-এর দৈর্ঘ্য অস্বাভাবিক প্রায় 100 কিমি-এর বেশি, গতিবেগ প্রচন্ড 500-1000 কিমি, উচ্চতা গভীর সমুদ্রে গড়ে 30 সেমি থেকে 1 মিটার পর্যন্ত। উপকূলীয় অঞ্চলে জলের গভীরতা কমে যাওয়ার সাথে সাথে ঢেউ-এর গতি কমে কিন্তু উচ্চতা বৃদ্ধি পায় এবং গড়ে 10-15 মিটার উঁচু ঢেউ খাড়া দেওয়ালের মতো প্রচন্ড শক্তি ও গতিতে সবকিছু

ধ্বংস করে সম্মুখে অগ্রসর হয়। সমুদ্রের নিচে ভূগাঠনিক কারণে সুনামি সৃষ্টি হয় এবং গভীর সমুদ্রে অবস্থানকালে এর উপস্থিতি বোঝা যায় না বলে সতর্কীকরণে খুব বেশি সময় পাওয়া যায় না।

● সুনামির উৎপত্তি ও কারণ (Causes & Origin of Tsunami):-

সমুদ্রতলে উচ্চ মাত্রার (magnitude) ভূমিকম্প (কমপক্ষে রিখটার স্কেলে 7.5 মাত্রা) হলে সুনামি সৃষ্টি হয়। বিস্ফোরক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভয়ঙ্কর সুনামি সৃষ্টি হয়। যেমন- ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে 1883 সালে 36 মিটার উঁচু সুনামি সৃষ্টি হয়েছিল। উপকূলীয় অঞ্চল বা মহীসোপান বা মহীঢালে ব্যাপক ভূপাত হলে সমুদ্রের জলসমতা নষ্ট হয়। দ্রুত সমুদ্রপৃষ্ঠের জলের সমতা রক্ষার জন্য তখন জলরাশিতে প্রচন্ড চাপের সৃষ্টি হয়। দুটি অভিসারী প্লেট সীমানায় সংকোচন গতির ফলে একটি প্লেটের নিচে অপরটি চাপা পড়ে যায় অথবা একটি অপরটির উপরে ওঠে যায়। ফলে প্লেট সীমানায় সমুদ্রের তলদেশে ফাটলের সৃষ্টি হয়ে সমুদ্র তলদেশের সমতা

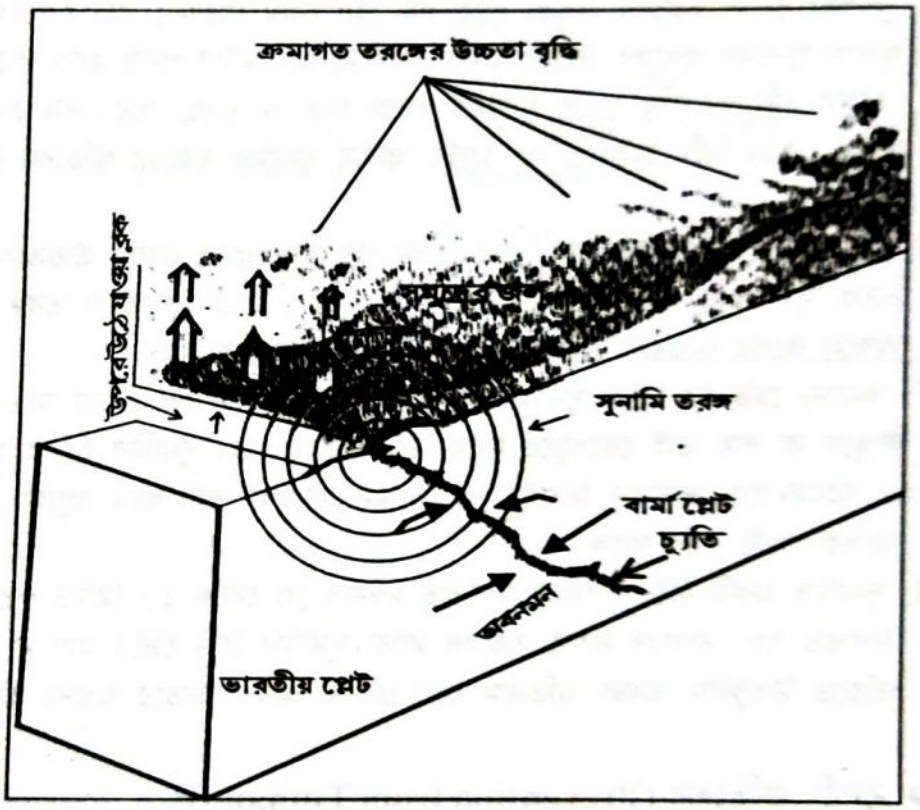

চিত্র - সুনামি তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য

বিনষ্ট হয়ে সুনামির সৃষ্টি হয়। সমুদ্রের নিচের ভূভাগে চ্যুতির সৃষ্টি হলে চ্যুতির এক অংশ উপরে ওঠে যায় এবং অপর অংশ নিচে নেমে সমুদ্রের জলের সমতা নষ্ট করে। ফলে সুনামির উৎপত্তি হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 2004 সালের 26 ডিসেম্বর ইন্দো-অস্ট্রেলিয় প্লেট মায়ানমার প্লেটের (এশিয়া প্লেটের অংশ)নিচে ঢুকে যাওয়ার

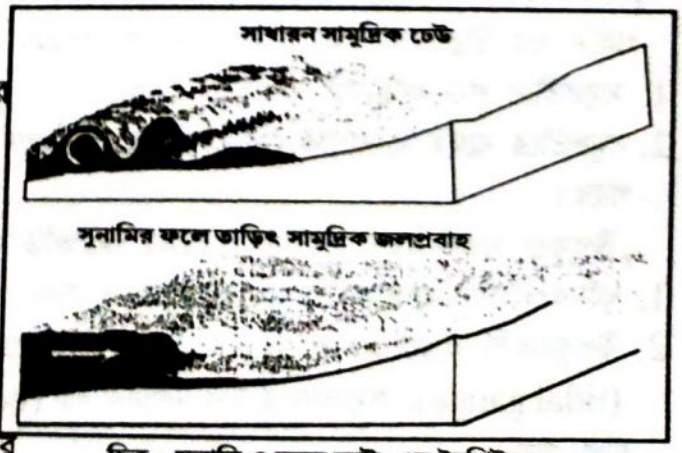

চিত্র - সুনামি ও সমুদ্র ঢেউ-এর বৈশিষ্ট্য

ফলে 2400 কিলোমিটার দীর্ঘ একটি চ্যুতির প্রায় অর্ধেক বা প্রায় 1200 কিমি স্থান 10 থেকে 12 মিটার পর্যন্ত হঠাৎ উপরে ওঠে যায়। এর ফলে 9.3 মাত্রার ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয় এবং 200 ট্রিলিয়ন টন জল স্থানচ্যুত হয়ে সুনামির সৃষ্টি করে, যা প্রাথমিকভাবে প্রায় 800 কিমি গতিতে অগ্রসর হয়।

● সুনামি তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য (Characteristic of tsunami waves):

1. সুনামি হচ্ছে এক ধরনের উচ্চ শক্তিসম্পন্ন সামুদ্রিক তরঙ্গ, যা বিভিন্ন কারণে সৃষ্টি হতে পারলেও সমুদ্রের নিচে ভূমিকম্পই প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত।
2. উৎপত্তির পর সুনামি তরঙ্গ কোনোটি গভীর সমুদ্রের দিকে আবার কোনোটি উপকূলের দিকে অগ্রসর হয়। তরঙ্গের গতিবেগ সমুদ্রের জলের গভীরতার ওপর নির্ভর করে।
3. গভীর সমুদ্রে সুনামি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য 100 কিমি-এর অধিক হলেও যতোই উপকূলীয় অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, ততোই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য কমতে থাকে।
4. দূরবর্তী সুনামি তরঙ্গের উচ্চতা খুবই কম- 30 সেমি থেকে 1 মিটার পর্যন্ত হলেও উপকূলীয় অঞ্চলে সুনামির তরঙ্গের উচ্চতা কখনো কখনো 40 মিটার পর্যন্ত হতে পারে।
5. জলের গভীরতা বৃদ্ধি পেলে সুনামির তরঙ্গে গতিবেগ বৃদ্ধি, পায়। সাধারণত দূরবর্তী সুনামি 500 থেকে 1,000 কিমি বেগে ধাবিত হলেও স্থানীয় সুনামির তরঙ্গের গতিবেগ উপকূলীয় অঞ্চলে অনেক কম।
6. সমুদ্র তীরে সুনামির জলের উচ্চতা যখন গড় সমুদ্রপৃষ্ঠের জলের উচ্চতার উপরে ওঠে, তখন তাকে 'সুনামি রান-আপ' (Tsunamirun-up) বলে। এ রান-আপ বা তরঙ্গ ব্যাপকতা উপকূলীয় অঞ্চলে জলের দেওয়াল সৃষ্টি করে এবং আকস্মিক বন্যার কারণ।
7. অন্যান্য ঢেউ-এর মতো সুনামি ঢেউ-এর অগ্রবর্তী লাইন ভেঙে যায় না। বিপুল শক্তিশালী জলরাশি সম্মুখে যা পায় তাই ভেঙেচুরে সাথে নিয়ে অগ্রসর হয়। সুনামির জলের স্রোতের সাথে প্রবাহমান এ আবর্জনাকে 'ভাসমান মিসাইল' বা 'সুনামি মিসাইল' বলা হয়। এগুলো মানুষের জানমানবের ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে।
8. সুনামির একটি ঢেউ উপকূলে উপস্থিত হওয়ার 20 থেকে 40 মিনিট পর দ্বিতীয় ঢেউ এসে উপস্থিত হয়। সাধারণ সাগর তরঙ্গের মতো সুনামির ঢেউ ভেঙে যায় না বরং, এটি পূর্ণশক্তি ও গতিতে উপকূলীয় অঞ্চল অতিক্রম করে দেশের আরও ভিতরে অগ্রসর হয়।

● সুনামি প্রতিরোধ (Prevention from Tsunami):-

সুনামির ভয়াবহতা থেকে পৃথিবী ও মানবজাতিকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা সম্ভব নয়। তবে কিছু ব্যবস্থা গ্রহনে এর তীব্রতাকে কমানো যেতে পারে। যেমন-

1. সমুদ্রতীরে শক্ত প্রতিরোধ দেওয়ালে তোলা।
2. সমুদ্রতীরে যথেষ্ট ম্যানগ্রোভ (যা নোনা জলে বাঁচতে পারে) জাতীয় গাছ লাগানোর কথা ভাবা যেতে পারে।

উপযুক্ত সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় সুনামির ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব। এই ব্যবস্থারূপে-

1. ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলের সিসমোগ্রাফ যন্ত্রকে উন্নত করা ;
2. উপকূলবর্তী অঞ্চলের দেশগুলির সমুদ্রের ঢেউ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য জোয়ার মাপক যন্ত্র (tidal gauge), সমুদ্রজলের চাপ নির্ণায়ক যন্ত্র (bottom pressure sensor) ইত্যাদির পরিষেবা বৃদ্ধি করা ;

3. সর্বোপরি বিভিন্ন দেশের সুনামি সতর্কীকরণ কেন্দ্রের (National Tsunami Early Warning Centre) মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন ইত্যাদির উপর গুরুত্ব বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বিশ্বে সর্বাধুনিক এ জাতীয় সতর্কবার্তা কেন্দ্রটি রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের হনলুলুতে।

ভূ-আলোড়ন ও ভূমিকম্পের তুলনা
(Difference between Earth Movement and Earthquake):

ভিত্তি	ভূ-আলোড়ন	ভূমিকম্প
1. প্রকৃতি	এটি ধীরে বা দ্রুত পরিবর্তনকারী অর্ন্তজাত শক্তি।	এটি অতি দ্রুত পরিবর্তনকারী অর্ন্তজাত শক্তি।
2. পরিমাপ যোগ্যতা-	এতই ক্ষীণগতিসম্পন্ন যে এটি পরিমাপ অযোগ্য। তবে এর প্রভাবে ভূমিরূপের পরিবর্তন বোঝা যায়।	এটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি দ্বারা পরিমাপযোগ্য। যথা- সিসমোগ্রাফ দ্বারা ভূমিকম্প মাপা হয়।
3. স্থায়িত্ব-	ভূত্বক সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজও একইভাবে কার্যকরী আছে।	এর প্রভাব খুবই ক্ষণস্থায়ী। এটি সবসময় ক্রিয়াশীল থাকে না।
4. ব্যাপ্তি-	এটি আঞ্চলিক বা সারা বিশ্বব্যাপী ভূমিরুপের পরিবর্তন ঘটায়। ভূত্বক পরিবর্তনে এর ভূমিকা ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী।	এটি সীমিত অঞ্চলে ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটায়। ভূ-ত্বকের পরিবর্তনে এর প্রভাব অনেক কম।
5. অনুভূতি-	এটি মানুষ বুঝতে পারে না বা ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না।	এটি মানুষ টের পায় ও শক্তিশালী ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি হয়।